অকালে ঝরে পড়া
আমার অতি আদরের বোন
করুণার স্মৃতিতে

বিংশ শতাব্দীর কান্না

(তৃতীয় পর্ব)

BINGSHA SHATABDIR KANNA

(THIRD PART)

a Novel in Bengali

BY

DILIPKUMAR SAHA

Price : Rupees Eight Only

॥ অন্যান্য রচনা ॥

প্রাণদণ্ড

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস

পরিণাম

মণিদীপা সেন

বিংশ শতাব্দীর কান্না (১ম পর্ব)

বিংশ শতাব্দীর কান্না (২য় পর্ব)

প্রিয়তমাসু

একটু নরম সুখ

অভিশপ্ত দশক [যন্ত্রস্থ]

ভূমিকা

অবশেষে ক্রন্দসী জীবনের রক্ত পেয়ালা পূর্ণ হলো।

শেষ হলো শ্রীমান দিলীপকুমার সাহার সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের এবং নতুনতর আঙ্গিকের উপন্যাস 'বিংশ শতাব্দীর কান্না'-র ইতিবৃত্ত কাহিনী।

কিন্তু শেষ করার পরও শেষ হয় কই ?

ভ্রান্ত সামাজিক মর্যাদার বলী সন্ধ্যা ঘোষ, প্রণয়-দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত স্বরিতা ভট্টাচার্য, ক্ষুব্ধ হৃদয়ের দুর্ভার পীড়নে ক্লিষ্ট মলয় সেন, প্রণয়-প্রাবল্যে অশান্ত মানস সিংহ, একমাত্র কন্যার জীবন রক্ষার্থে ব্যর্থ নিঃশেষিত সতীত্বের বিবর্ণ প্রতীক মাধুরী হালদার এবং সর্বোপরি ভাগ্যের নির্মম শিকার আপন আত্মজার প্রণয়-পুরুষ অভিজিৎ লাহিড়ী অনিঃশেষ প্রশ্ন নিয়ে শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে হাজির হয়। আঘাত করে অভিশপ্ত শতাব্দীর মানসিক বৈক্লব্যে এবং স্থবির বিবেক-বোধের ভিত্তিমূলে।

নাটকীয় সংঘাত এবং কাব্যমেজাজের সুষম সমন্বয়ের বাঙ্‌ময় বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল আলোচ্য গ্রন্থখানা নিঃসন্দেহে রস-পিপাসু পাঠকের মনোজগতে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে।

বিনয় সরকার
সাধারণ সম্পাদক
বাংলা সাহিত্য একাডেমি

॥ ১ ॥

বিশ-শতকী কালো ছায়াটা অকস্মাৎ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। সর্বহারা জনতার ম্লান পাণ্ডুর মুখগুলো আমার নিস্তরঙ্গ মনকে বার-বার আলোড়িত করে। বিঘ্নিত হয় আমার বহতা বিশ্রাম। বিপর্যস্ত হয় আমার বিরাজিত জীবন-দর্শন। আন্দোলিত হয় আমার বোহেমিয়ান জীবন-ধারা ক্ষয়িষ্ণু মনুষ্যত্বের আর্ত কান্নার শব্দিত বিষাদে। ছিন্ন হয় আমার মেসীয় জীবনের ধূসর নির্মোক এদের অতৃপ্ত তৃষ্ণার আগ্নেয় ঘ্রাণে।

চলার পথে ফেলে-আসা বিশ-শতকী বেদনার পেয়ালাটা অশরীরী ছায়া নিয়ে জেগে ওঠে আমার শ্রান্ত মানসলোকে। অনির্বাণ আবেগে আঘাত করে আমার চেতনার প্রান্তে। অপ্রতিরোধ্য সেই আঘাতে আবার চঞ্চল হয়ে উঠি আমি। চঞ্চল হয়ে ওঠে আমার সুপ্ত সাহিত্য-চিন্তা। আমার নির্বিকার হৃদয়ের প্রসারিত প্রচ্ছায়া।

চোখের কোণে জ্বলে ওঠে ফ্লাড্-লাইটের অয়স্কঠিন রোমন্থন। বিচ্ছুরিত হতে থাকে ধ্রুপদী তৃষ্ণার নশ্বর রঙ। উদ্ঘাটিত হতে থাকে পলেস্তারা-খসা জীবনের নগ্ন বিষণ্ণ কঙ্কাল। প্রতিভাত হয় বিষাক্ত-ক্ষরণের ক্রন্দসী স্বপ্ন। প্রতিভাত হয় শবায়িত হৃদয়ের নিথর নিশ্চল ফসিল অচিকিৎস্য লাভার সুস্পষ্ট বীক্ষণে।

আবার আরম্ভ হয় আমার মৌন-মুখর পরিক্রমণ। আরম্ভ হয়

প্রগাঢ় পৃথিবীর প্রবৃদ্ধ কোণে বিস্মিত বিশ-শতকী বেদনার রক্তাক্ত ছবি আঁকা। সুরু হয় বিবসা বিশ্বের অতলান্ত বহতায় নিমজ্জিত বিংশ শতাব্দীর অনির্বাণ কান্নার মুঠো মুঠো ভ্রাণ সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার দুঃসাহসিক প্রয়াস। সুরু হয় শিশির ভেজা শরতের বিধুর কান্নার মতো বিষণ্ণ ভাগ্যহত মানুষগুলোর লবণাক্ত অশ্রুতে লেখা নিঃশেষিত স্বপ্নাশার বিয়োগান্ত ইতিবৃত্ত বিংশ শতাব্দীর কান্নার করুণতম অধ্যায়।

॥ ২ ॥

ঘরে ঢুকে দীপ্তেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। দেখে একটা বিয়োগান্ত সনেটের মতো একরাশ বিষণ্ণতা নিয়ে সন্ধ্যা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখের কোণে চিক চিক করছে কয়েক ফোঁটা জল।

দীপ্তেন কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। দুর্বার এক আবেগে ওর সমস্ত সত্তা থর থর করে কেঁপে ওঠে। ঘেমে ওঠে ওর সমস্ত শরীর। ওর গলা শুকিয়ে আসে। হৃদয়-সৈকতের অশান্ত তরঙ্গ চেতনার তটভূমিতে বারবার আছড়ে পড়ে। ভেঙ্গে পড়ে চেতনার প্রান্তভূমি বহতা ভালোবাসা হয়ে। ছল্‌কে ওঠে উচ্ছ্বসিত মনের মাধুরী বৈশাখী ঝড়ের কবোষ্ণ আবেগে।

দীপ্তেন খুব অসহায় বোধ করে। পাহাড়ী যৌবনের আতপ্ত কামনা ওর তৃষিত শিরার প্রতিটি ভাঁজে শব্দিত হতে থাকে। একটা সর্বনাশা ঝড়ের প্রসারিত অস্তিত্ব ওর মনকে ক্রমিক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। অনেক চেষ্টা করেও ও নিজেকে সংহত করতে পারে না। পারে না অন্ধ বিবেকের অস্বচ্ছ কফিনে জীবন্ত বর্তমানকে আবরিত করতে।

বেশ কিছু সময় ইতস্ততঃ করে দীপ্তেন। তারপর সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে যায়। যতটা সম্ভব কণ্ঠস্বর অবিকৃত রেখে ও সন্ধ্যাকে ডাকেঃ

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কি করছেন?

বিস্ময়-চকিত সন্ধ্যা ঘুরে দাঁড়ায়।

এ কী! আপনি! কখন এলেন?

মিনিট পাঁচেক।

যাঃ, মিথ্যে কথা!

না, সত্যি। সত্যিই প্রায় মিনিট পাঁচেক যাবৎ আপনার ধ্যান ভাঙ্গার অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

তা একবার ডেকে আমার ধ্যান ভাঙ্গালেন না কেন?

স্মিত হেসে সন্ধ্যা কথাটা দীপ্তেনকে ছুঁড়ে দেয়।

দীপ্তেন কোন জবাব না দিয়ে মৃদু হাসতে থাকে।

সন্ধ্যাই আবার কথা বলে ঃ

আপনার বন্ধু এ কথা শুনলে কি ভাববে বলুন তো?

কিছুই ভাববে না।

ভাববে না বুঝি?

না। কারণ যে ব্যক্তি তার অর্ধাঙ্গিনীর চোখের জলের উৎস খুঁজে দেখে না, তার অন্তরের গুমরে-মরা নারীত্বের কান্না শুনতে পায় না, সে তার বন্ধুর মনের খবর জানতে ব্যগ্র হবে—এ কথাটা আর যেই ভাবুক, আপনি অন্ততঃ তা ভাবতে পারেন না।

সন্ধ্যা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে ঃ

দীপ্তেনবাবু!

আত্ম-প্রতারণা করে কোন লাভ নেই, সন্ধ্যা দেবী!

আত্ম-প্রতারণা?

হ্যাঁ, আত্ম-প্রতারণা। এটাকে আমি আত্ম-প্রতারণা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। কুণালকে আমি ছোটবেলা থেকেই জানি। ও বরাবরই আত্ম-কেন্দ্রিক। আর ভীষণ রকম স্বার্থপরও। তাছাড়া—

তাছাড়া—

তাছাড়া একটু বেশি মাত্রায় সেক্সিও। অথচ সীমিত ওর ক্ষমতা। ওর সামর্থ্য, ওর পৌরুষত্ব। আর সেই কারণেই ওর বিয়ের ব্যাপারে আমি নিরাসক্ত ছিলাম বরাবর।

এ সব—এ সব আপনি কি বলছেন, দীপ্তেনবাবু?

কেন, আপনি কি এতদিনেও এটা বুঝতে পারেননি?

অতীব বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্নটা বেরিয়ে আসে দীপ্তেনের মুখ থেকে।

না না, আমি পারিনি। কিছুই বুঝতে পারিনি আমি। ওরা আমায় কিছুই বুঝতে দেয়নি, দীপ্তেনবাবু!

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বিজনেস ম্যাগ্‌নেট কুণাল ঘোষের স্ত্রী সন্ধ্যা ঘোষ।

দীপ্তেন দ্রুতগতিতে ওকে ধরে ফেলে। পরম দরদে ওর মাথায় আন্তরিকতার স্পর্শ বুলিয়ে দেয়।

কান্না ভেজা গলায় সন্ধ্যা বলতে থাকে ওর অন্ধ জীবনের চরম ব্যর্থতার কাহিনী।

দীর্ঘ সাত বছরের বিবাহিত জীবনের লোমশ কালো অধ্যায়টা সৌন্দর্যহীন বৈফল্যের ঘনবনে একমুঠো সোনাও আহরণ করতে পারেনি। এই দীর্ঘ সময়ে একটি রাতও সে তার স্বামীর কাছ থেকে কোন নির্ভরতার আশ্বাস পায়নি। পায়নি তার সহৃদয় মমতার সামান্যতম প্রতিশ্রুতিও। একটা অসমর্থ মাংসপিণ্ডকে সতী-সাধ্বী স্ত্রী হিসেবে বারবার গ্রহণ করতে হয়েছে দুঃসহ অন্তর্জ্বালা ভোগ করে।

কামার্ত স্বামীর নগ্নতর সম্ভোগে কখনো কখনো ও অপরিসীম লজ্জা অনুভব করেছে। নীল হয়ে গিয়েছে তীব্রতম যন্ত্রণায়। করুণ কান্নায় স্বামীর দয়া ভিক্ষা করেছে। কিন্তু বিরাটাকার দৈত্যের মতো স্বামী দেবতাটি ওকে সজোরে চেপে ধরেছে। একে একে খুলে নিয়েছে ওর শাড়ী ব্লাউজ শায়া বডিস সব।

তারপর ওর নগ্ন দেহটা নিয়ে মেতে উঠেছে প্রচণ্ড লালসায়। দুমড়ে মুচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছে ওর ক্রন্দসী নারী সত্তা।

তবুও—তবুও মুখ বুজে সন্ধ্যা কুণালের সব অত্যাচার সহ্য করতো। সহ্য করতো শুধু এক টুকরো আশার আলো খুঁজে পাবার জন্যে। অনাগত এক শিশুর আনন্দ উচ্ছল কলহাসি শোনবার জন্যে।

সন্ধ্যা থামে। চোখের জল মুছে নেয় শাড়ীর প্রান্ত দিয়ে।

দীপ্তেন সন্ধ্যার মুখের দিকে তাকায়। কি যেন বুঝতে চেষ্টা করে ওর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। তারপর প্রশ্ন করেঃ

আপনি উচ্চশিক্ষিতা। বিদুষী। অথচ আপনি এই দীর্ঘ সাত বছর ধরে—

সন্তান-কামনা নারীর সহজাত, দীপ্তেনবাবু। সন্তান লাভের আশায় সে সব কিছু সহ্য করতে পারে। আমিও—

কিন্তু কুণালের দ্বারা সেটা যে সম্ভব নয়, এটাও কি বোঝেননি কখনো? কোন ডাক্তারের সঙ্গে—

ওরা বুঝতে দেয়নি আমাকে সে কথা। বরং ওদের হাউস ফিজিসিয়ান ডাক্তার ভার্মা বরাবর আমার জন্যেই দামী দামী ওষুধ প্রেসক্রাইব করতো।

সে কী? একজন ডাক্তার এমন একটা নোংরা ষড়যন্ত্রে—

ভুলে যাবেন না, দীপ্তেনবাবু, ডাক্তার ভার্মা ওর কাছ থেকে মোটা টাকা ফি পান প্রতিমাসে।

তারপর ডাক্তার মহাপ্রভুর এমন একটা আবিষ্কারের কি ফল হলো?

কণ্ঠে ব্যঙ্গ ঝরিয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় দীপ্তেন।

সুরু হলো আমার দুঃখের জীবন। চরম অপমান আর লাঞ্ছনা মাখানো এক দুঃসহ ঘৃণ্য জীবন। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়েরা, এমন

কি, বাড়ির ঝি-চাকরেরা পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে আমায় মনে করিয়ে দিতো আমি এদের সংসারে অনাকাঙ্ক্ষিতা। অলক্ষ্মী।

আর কুণাল?

ও ভয় দেখাতো ও আবার বিয়ে করবে। আর তাই আমায় সরে যেতে হবে।

কোথায়?

যেখানে খুশী। কাউকে দায়ী না করে বিষ খেলেও ওর আপত্তি নেই। আজও সেই কথাই বলে গেলো ও।

তাই বুঝি জানালার ধারে দাড়িয়ে বোকার মতো কাঁদছিলে?

বলতে বলতে দীপ্তেন এগিয়ে আসে সন্ধ্যার নিকটতর সান্নিধ্যে। দীপ্তেনের তপ্ত নিঃশ্বাস, দুচোখের মমতা-মাখানো নির্ভরতার আশ্বাস সন্ধ্যার বিমনা হৃদয়ে সুরের মূর্চ্ছনা আনে। ওর ছায়া কাঁপে। ঘনিষ্ঠ হয়। নুয়ে পড়তে চায় দীপ্তেনের উষ্ণতম সান্নিধ্যে। উত্তরিত হতে চায় ইথার থেকে ইথারে।

দীপ্তেনের বুকে মাথা রেখে সন্ধ্যা ভাবে দীপ্তেন কি পারবে না ওর নিঃস্ব রিক্ত বেদনার্ত নারী-হৃদয়ের সব অপূর্ণতা ঘুচিয়ে ওকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে?

কুণাল-সন্ধ্যা-দীপ্তেন। এই ত্রিভুজ হৃদয়-দ্বন্দ্বের কাহিনীটা যদি এখানেই শেষ করতে পারতাম, তবে হয়তো 'বিংশ শতাব্দীর কান্না'র 'শেষ পর্ব'-র কোন প্রয়োজনই থাকতো না। 'প্রতীক্ষার শেষে' বা 'মধুর মিলন'—এমনি গোছের কোন নামের মাহাত্ম্যে ফিল্মী দুনিয়াকে চমকে দিতে পারতাম। শুধু দু-চারটে মারপিট আর ক্যাবারে ডান্সের সঙ্গে আদিরসের পাঞ্চকরা ধর্ষণের ককটেল! ব্যাস্, আর দেখতে হতো না! সন্ধ্যা ঘোষের খোলা বুকের ওপর দিয়ে আমি আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে সর্বোচ্চ শিখরে উঠে যেতে পারতাম অনায়াসে।

কিন্তু হায়, আমার ভাগ্যটাই খারাপ। মনের রঙিন আশাগুলো চিরদিন স্বপ্ন হয়েই রয়ে গেলো। বাস্তবের প্রগাঢ় আলিঙ্গনে কোন-দিনই আর ধরা দিলো না। তাই চিরটা কাল শুধু নোনাধরা মেসের স্যাঁতসেঁতে কোটরে বসে কান্নার মিছিল আঁকতে হলো। শ্রীমান পূর্ণচন্দ্রের ডিক্টেটরী আর পুঁচকে দেবেনের খবরদারী সহ্য করেই জীবনটা কাটাতে হলো।

কি ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন নাকি?

বোধহয় আত্মচিন্তায় সুবেশা সুন্দরী সঙ্গিনীকে ভুলে গিয়েছিলাম। একটা মারাত্মক অন্যায় করে ফেলেছি এমন একটা ভাব সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে উত্তর দিলাম:

কি যে বলেন! শ্রীমতী সুনন্দা সান্যালের মতো একজন কবোষ্ণা নারীর পাশে বসে আমি ধ্যানস্থ হয়ে পড়বো—আমি কি এতই বেরসিক ভাবছেন?

কথাটা এতই আকস্মিক যে, সুনন্দা দেবী প্রস্তুত ছিলেন না এমন একটা উষ্ণ উত্তরের জন্যে। স্বভাবতঃই উনি খুব লজ্জা পেলেন। ওর সলজ্জ মুখের তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ হলো রক্তিমাভ। উনি ত্রাস করলেন।

ওর অসহায় অবস্থা দেখে আমি তাড়াতাড়ি হাল ধরলাম:

অজয়বাবুর খবর কী? কবে ফিরছেন ও-দেশ থেকে?

আমার প্রশ্নে চমকে ওঠেন উনি। নিস্তেজ গলায় উত্তর দেন:

কে জানে!

সে কী? কিছু লেখেন না ফেরা সম্পর্কে?

না। চিঠি লেখার সময় বোধহয় তেমন পায় না আজকাল।

আপনাকে চিঠি লেখার সময় পান না?

আমার স্বরে রীতিমতো অবিশ্বাসের ইঙ্গিত।

কিন্তু সুনন্দা দেবী সম্ভবতঃ এ প্রসঙ্গ এড়াতে চান। হয়তো নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে। হয়তো কুণাল-সন্ধ্যা-দীপ্তেন-কাহিনীর শেষটুকু শোনবার স্বাভাবিক কৌতূহলে। তাই আমার প্রশ্নের উত্তরের পরিবর্তে উনি অন্যদিক থেকে আমার দিকে তীর নিক্ষেপ করলেন ঃ

আপনার উদ্দেশ্য কি বলুন তো, শোভনলালবাবু? আপনি কি আমাকে নায়িকা করে আরেকখানা 'বিংশ শতাব্দীর কান্না' লিখতে চান নাকি? কিন্তু সেটি হচ্ছে না, মশাই!

এমন একটা আক্রমণের জন্যে তৈরী ছিলাম না। অবশ্য তার জন্যে কোন অসুবিধা হলো না। কারণ অকস্মাৎ আক্রমণের হাত থেকে অকস্মাৎ আত্মরক্ষায় আমি বরাবরই পারদর্শী। বরং একটু বেশী মাত্রায়ই পারদর্শী। কাজেই সঙ্গে সঙ্গেই রেডিমেড উত্তরটা ওর দিকে ছুঁড়ে দেই ঃ

আপনার চোখে কান্নার ছবি কোথায়, সুনন্দা দেবী? সবই যে ডক্টর অজয় হালদারের জলছবি!

নাঃ, আপনার সঙ্গে কথায় পারবো না!

কথা-সাহিত্যিক কিনা, তাই!

কিন্তু কথা-সাহিত্যিক মশাই, আপনি কিন্তু কথার নেশায় বুঁদ হয়ে গল্পটার খেই হারিয়ে ফেলছেন।

ওটা গল্প নয়, ম্যাডাম। কাজেই খেই হারাবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

সত্যি বলছেন—এতক্ষণ যা বললেন তা গল্প নয়? সবকিছুই সত্যি?

হ্যাঁ, সুনন্দা দেবী। ওটা গল্প নয়। ওটা ঘটনা। এই আপনি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, জহর পর্বতের ঠিক এই জায়গাটাতেই ওরা সেদিন এসে দাঁড়িয়েছিলো।

ওরা !

ওরা, মানে সন্ধ্যা এবং দীপ্তেন।

শ্রীমতী সুনন্দা সান্যাল গভীর ঔৎসুক্যে তাকিয়ে থাকেন আমার দিকে।

জুন মাস। তাহলেও শৈল শহর দার্জিলিঙের আকাশ এই মুহূর্তে মেঘশূন্য। নিঃসীম নির্মল। পূর্ণযৌবনা চাঁদের আলোয় এক কালের বার্চহিল তথা আজকের জহর পর্বতের বুকে স্নিগ্ধ আলোর রোশনাই। কথা বলা এবং কথা শোনার পক্ষে এমন একটা মনোরম পরিবেশের আকর্ষণ নিঃসন্দেহে অপরিসীম।

আমি সুরু করি ঃ

শরীর অসুস্থ বলে কুণাল হোটেলেই শুয়েছিলো। আর কুণালের অনুরোধে সন্ধ্যাকে নিয়ে দীপ্তেন গিয়েছিলো হিমালয়ান জু এবং মাউণ্টেনীয়ারিং ইন্‌স্টিটিউট দেখাতে। আর সবশেষে ওরা দুজনে এসে দাঁড়িয়েছিলো এইখানটাতে।

তখন দিনান্তের সূর্য তার শ্রান্ত ক্লান্ত দেহের বিশ্রামের প্রয়োজনে প্রস্থানোদ্যত। সারা জহর পর্বতে ছড়িয়ে পড়েছে ধূসর অন্ধকারের গাঢ়তর প্রচ্ছায়া। সন্ধ্যা এবং দীপ্তেন নির্জন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। উভয়ের চিন্তার মূল বিন্দুতে প্রভাতী-সূর্যের আগমনী সঙ্গীত। যে সঙ্গীত রচনা করেছে ওদেরই দ্বৈত-হৃদয়ের তৃষিত প্রণয়।

সময় এগিয়ে চলে ঘড়ির কাঁটা ধরে। নেমে আসে রাতের ঘন অন্ধকার। চাপ চাপ কালো অন্ধকার। আর এই কালো অন্ধকারের শীতল ছোঁয়ায় ওদের তন্ময়তা কাটে। হোটেলে ফেরার জন্যে ওরা প্রস্তুত হয়।

তুমি একটু অপেক্ষা করো, সন্ধ্যা। আমি একবার—

তোমার সত্যি ডায়াবেটিসে ধরেছে।

সন্ধ্যার কথা শেষ হতে উভয়েই একসঙ্গে হেসে ওঠে।

বেশী দেরী করবে না কিন্তু। এখানে যা অন্ধকার !

না, দেরী হবে না। তুমি একটু সাহস করে—

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই দীপ্তেন সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

সন্ধ্যা চারপাশে তাকায়। দেখে একটা নিঃসীম নৈঃশব্দিক অন্ধকার ওর শরীরী দেহটা ঘিরে রয়েছে। ওর ভালো লাগে আবরিত অন্ধকারের এই মনোরম স্নিগ্ধতা। তার সুবিস্তৃত ব্যাপ্তি। হোমবহ্নির শিখার মতো তার অনির্বাণ তৃষ্ণা। মুঠো মুঠো কালো অন্ধকারের মাঝে সন্ধ্যা ক্রমশঃ তন্ময় হয়ে যায়।

অকস্মাৎ অন্ধকার ভেদ করে একটা কর্কশ হাত এসে সন্ধ্যার কাঁধ স্পর্শ করে। ভয় পেয়ে সন্ধ্যা চিৎকার করে ওঠে ঃ

এ কী, তুমি ! তুমি আমাকে—

কথাগুলো শেষ হয় না। শুধু একটা নিষ্ঠুর পতনের শব্দে সমস্ত পটভূমি কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে কেঁপে ওঠে মাত্র।

সুনন্দা দেবী উত্তেজিত ভাবে বলে ওঠেন ঃ

উঃ কী নিষ্ঠুর জঘন্যতা ! শিল্পী দীপ্তেন রায়ের মধ্যে এমন একটা পাশব প্রবৃত্তি লুকিয়ে ছিলো ? আশ্চর্য !

হ্যাঁ, এটা নিষ্ঠুরতাই। নির্মম নিষ্ঠুরতা। তবে সন্ধ্যা ঘোষ শিল্পী দীপ্তেন রায়ের নিষ্ঠুরতার বলী হয়নি। যদিও দীর্ঘ তিনটি মাস দীপ্তেনকে জেলে কাটাতে হয়েছিলো।

তাহলে খুনী কে ? কুণালবাবু ? নিশ্চয় উনিই তাহলে খুনী। অবিশ্বাসী স্ত্রীকে উনিই খুন করেছিলেন।

না। কুণাল খুন করেনি। স্ত্রীকে খুন করার মতো কোন স্ট্রং মোটিভ ওর ছিলো না। তেমন মানসিক দৃঢ়তাও ওর ছিলো না। তাছাড়া—

তাছাড়া—

তাছাড়া দীপ্তেনের সঙ্গে সন্ধ্যার অবৈধ প্রণয়ের কথা ও কিছুই জানতো না। এমন কি সন্ধ্যার গর্ভস্থ সন্তান যে ওর নিজের নয়—এটাও ও জানতো না।

কিন্তু তা কেমন করে হবে? কুণালবাবু যে অসমর্থ—এ কথাটা তো সন্ধ্যা দেবীর জবানীতেই জানা গেছে।

তা গেছে।

তবে?

তবে সেটা তো কোন ডাক্তারী অভিমত নয়।

আপনি কিন্তু আবার হেঁয়ালি আরম্ভ করেছেন, শোভনলালবাবু। সবকিছু আপনার কথার জারকে মিশিয়ে রহস্য করে তুলছেন। প্লিজ, সবকিছু একটু প্রাঞ্জল করে বলুন।

আমি বুঝতে পারি শ্রীমতী সুনন্দা সান্যাল খুবই অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। বিশেষ, ঘটনাটা ধীরে ধীরে শার্লক হোম্‌সের এক্তিয়ারে চলে যাচ্ছে দেখে উনি শঙ্কিত হন। রিস্টওয়াচটা একবার দেখেও নেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। নির্জন প্রকৃতির রাজ্যে হানা দিয়েছে ফিকে পাত্‌লা অন্ধকার। আকাশের বুকেও সুরু হয়েছে ধুসর মেঘের রিহার্শাল। ক্রমশঃ ম্লান হয়ে পড়ছে পূর্ণচন্দ্রের দুরন্ত তেজ।

সুতরাং কুণাল-সন্ধ্যা-দীপ্তেন-কাহিনীর উপসংহার টানতে এগিয়ে যাই আমি ঃ

তাহলে শুনুন। দীপ্তেনের সঙ্গে মিলনের পর থেকে সুন্দরী সুশিক্ষিতা সন্ধ্যা অদিম নারীর মতোই হয়ে উঠলো মোহময়ী। হলো রহস্যময়ী। ভালোবাসার তপ্ত অভিনয়ে মুগ্ধ করে রাখলো স্থূলবুদ্ধি কুণালকে। বেঁধে ফেললো তাকে কবোষ্ণ যৌবনের মোহিনী মায়ায়।

নিষ্ঠুর ও জান্তব প্রকৃতির কুণাল ধীরে ধীরে হারালো তার সমস্ত ব্যক্তিত্ব। সম্পূর্ণ পোষ মানলো সে। বলা যায় স্ত্রীর হাতের খেলার পুতুলে পরিণত হলো সে।

আর স্বামীর মুগ্ধতার সুযোগ নিয়ে সন্ধ্যা নির্ভাবনায় মিলিত হতে লাগলো তার দয়িতের সঙ্গে। অবশ্য সেই সঙ্গে নানা রকম তাবিজ-কবজ ধারণের কোন ত্রুটি করলো না স্বামীর চিন্তাকে ভিন্নমুখী রাখতে। কাজেই সন্ধ্যার. কোন চিন্তাই ছিলো না ওর গর্ভস্থ সন্তানকে নিয়ে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না।

মহাকালের মন্দিরে অভীষ্ট পূজো দেবার অছিলায় সন্ধ্যা যখন দার্জিলিঙ যাবার প্রস্তাব করলো, কুণাল খুব খুশী মনে সম্মতি জানালো অনাগত সন্তানের কল্যাণ কামনায়।

একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই শিয়ালদহ স্টেশনে ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো দীপ্তেনের। দীপ্তেনও দার্জিলিঙ যাচ্ছে। আর যাচ্ছে ফার্স্ট ক্লাসেই।

কুণাল খুবই খুশী হলো। অনেকদিন পর হোস্টেলের মুখর জীবনটা ফিরে পাবার আশায় ও আনন্দ-চঞ্চল হয়ে উঠলো। দীপ্তেনকে আগাম অনুরোধ জানালো ওদের সঙ্গে একত্র থাকবার জন্যে। সন্ধ্যার কাছ থেকেও এলো সাদর আমন্ত্রণ। নিরুপায় দীপ্তেনকে রাজী হতেই হলো শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু একজনের মনে একটা সংশয়ের কাঁটা বিঁধে রইলো। সেই একজন কিছুতেই এই যোগাযোগটাকে আকস্মিকতা বলে মানতে পারলো না।

জীবনের অভিজ্ঞতা তার অপরিসীম। তাই সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়। এলোমেলো চিন্তার জাল ছিন্ন করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হয় না তার।

পরিকল্পনাটা ঠিকই ছিলো। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সবকিছু কেমন গোলমাল হয়ে গেলো। সন্ধ্যার গায়ে যে দীপ্তেনের ওভার কোটটা থাকতে পারে—এটা যে তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিলো!

ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। নিশ্চল নিথর হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সে।

ইতিমধ্যে দীপ্তেন ফিরে আসে। ওর পায়ের শব্দে তার বাস্তব-বোধ জেগে ওঠে। দ্রুত স্থান ত্যাগ করে সে। মিশে যায় অন্ধকার প্রকৃতির অতলান্ত বহতায়।

আমি একটু থামি। উৎকর্ণ শ্রোতার দিকে তাকিয়ে একটা চারমিনার ধরিয়ে নেই। মৌজ করে কয়েকটা টান দেই। তারপর আবার স্থুরু করি ঃ

ঘটনা পরম্পরা দীপ্তেনকে ঠেলে দেয় কারা প্রাচীরের অন্তরালে। চরম দণ্ডের জন্যে প্রহর গোণে ও নিরেট পাথরের কঠিন বুকে মাথা কুটে। দু-চোখে ওর ফুটে থাকে মহাসাগরের নিঃসীম শূন্যতা। বিরাজিত বিষাদের অপ্রতিরোধ্য স্থবিরতা।

শিল্পী দীপ্তেন রায়ের জঘন্যতম কাজের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে মহানগর কলকাতার সুসভ্য শালীন সমাজ। খবরের কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে থাকে জ্বালাময়ী ধিক্কারের নির্মম কষাঘাত।

এমন কি, এতদিন যারা শিল্পী দীপ্তেন রায়ের ফ্যান ছিলো, তাদের মুখেও ঝরতে লাগলো অমার্জিত ভাষার বিষাক্ত বিষ।

সকলেই একবাক্যে দাবী জানালো এমন নৃশংস খুনীকে আদর্শ সাজা দেওয়া হোক। সমাজকে করা হোক কলুষমুক্ত।

হ্যাঁ, আদর্শ সাজাই শিল্পী দীপ্তেন রায়ের কপালে জুটতো। ও নিজেও বুঝতে পেরেছিলো সে কথা। বুঝতে পেরেছিলো ফাঁসির মঞ্চেই ওকে গাইতে হবে ওর শিল্পী জীবনের শেষ গান!

নিজের শেষ কথা সকলকে জানাবার জন্যে ও জেলে বসেই একটা গান লিখে ফেললো। নিজেই তাতে সুর দিলো এক বৃষ্টি-ঝরা সন্ধ্যায়।

আর কী আশ্চর্য ! ঐ গানটাই ওকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দিলো ! ফিরিয়ে নিয়ে এলো খুনী আসামীকে ফাঁসির মঞ্চ থেকে।

চারমিনারে আবার কয়েকটা টান দেবার জন্যে আমি একটু থামি। শ্রীমতী সান্যাল এবার বেশ বিরক্ত হন। ক্ষুব্ধ স্বরে বলে ওঠেন ঃ

আপনি কিন্তু আবার হেঁয়ালি সুরু করেছেন, শোভনলালবাবু।

হেঁয়ালি কোথায় দেখলেন ?

হেঁয়ালি নয় ? একটা গান ফাঁসির আসামীকে বাঁচিয়ে দিলো ? অদ্ভুত সত্যি কথা আপনার !

অদ্ভুত মনে হলেও ঘটনাটা কাল্পনিক নয়, সুনন্দা দেবী। সত্যি সত্যিই ঐ গানটাই দীপ্তেনকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলো।

শ্রীমতী সান্যালের সন্দেহ তবু দূর হয় না। তাই ব্যঙ্গঝরা গলায় বলে ওঠেন ঃ

শিল্পী দীপ্তেন রায়ের গান শুনে জহ্লাদ বুঝি ভুল করে নিজের গলাতেই—

থামুন তো ! আগে সবটা শুনুন। তারপর মন্তব্য করবেন।

আমি প্রায় ধমকে উঠি।

সুনন্দা দেবী লজ্জিত হয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেন।

চারমিনারটায় আরেকটা টান দিয়ে আমি ফিরে যাই পুরনো কথায় ঃ

জেলার সাহেব এককালে কবিতা লিখতেন। গীতিকার হিসেবেও বন্ধুমহলে যথেষ্ট খাতির ছিলো তখন। দীপ্তেনের গানটা পড়ে ওর মনে সন্দেহের মেঘ ছায়া ফেলে। উনি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টে ওর একজন পুরনো সহপাঠীকে সমগ্র কেসটা খুলে বলেন।

আর সেই সহপাঠী ভদ্রলোকটিই, অর্থাৎ ডিটেকটিভ ইনস্‌পেক্টর শিশির গাঙ্গুলীই সবকিছু বিগড়ে দিলেন।

মানে?

মানে, শেষ পর্যন্ত সাধন মিত্র নিজেই সব কথা স্বীকার করলো। আর শিল্পী দীপ্তেন রায়ের সসম্মান পুনর্বাসন হলো ওর ফ্যানদের, তথা কলকাতার সুসভ্য সমাজে।

সাধন মিত্র? সাধন মিত্র আবার কে?

সন্ধ্যার দাদা।

সন্ধ্যার দাদা! উনিই তাহলে—

হ্যাঁ। কোলে-পিঠে করে মানুষ করা একমাত্র বোনটির ছলনা তার চোখে সেদিন ধরা পড়ে গিয়েছিলো। অবশ্য স্ত্রীর মুখে এমন একটা সন্দেহের কথা অনেকদিন যাবৎ সে শুনতে পাচ্ছিলো। কিন্তু তার স্নেহার্দ্র মন কিছুতেই এ সব কথা বিশ্বাস করতে চায়নি। হাজার হলেও সন্ধ্যা যে তার দাদারই বোন। সে মিত্তির বংশের মেয়ে। তার পক্ষে এমন পদস্খলন একেবারেই অসম্ভব।

কাজেই এতদিনের সেই বিশ্বাসটা ধ্বসে যাবার পর সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। আসন্ন সর্বনাশের ছবিটা তার মনকে ইস্পাত-কঠিন করে তোলে। একটা অয়স্কঠিন শপথে সে পরের দিনই দার্জিলিঙ ছুটে আসে।

দার্জিলিঙ পৌঁছে সে অলক্ষ্যে ওদের ওপর নজর রাখে। ছায়ার মতো সর্বত্র ওদের অনুসরণ করে।

ধীরে ধীরে সবকিছু তার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার

হয়ে যায়। আর সমস্ত কিছুর জন্যে সে দীপ্তেনকেই দায়ী করে। ঠিক করে, ছোট বোনের বিমনা জীবন থেকে সে ঐ ধূমকেতুটাকে সরিয়ে দেবে চিরতরে। সরিয়ে দেবে এই পৃথিবী থেকেই।

পরিকল্পনায় কোন ত্রুটি ছিলো না। কিন্তু সবকিছু গোলমাল করে দিলো দীপ্তেনের ঐ কালো ওভারকোটটা !

কথার ফাঁকে কখন যে চারমিনারটা শেষ হয়ে গিয়েছে টের পাইনি। সুতরাং আরেকটা ধরিয়ে নেই। বেশ আমেজ করে গোটা দুয়েক টান দেই। তারপর সুনন্দা দেবীর দিকে তাকিয়ে বলি ঃ

ম্যাডাম, সারা আকাশে মেঘেরা রণহুঙ্কার দিচ্ছে। আর দেরী করা ঠিক নয়। চলুন, ফেরা যাক।

হ্যাঁ, চলুন।

আমরা নিঃশব্দে ফিরে চলি আমাদের নিজের নিজের ডেরার দিকে।

॥ ৩ ॥

আকাশবাণী কলকাতা। একটি বিশেষ ঘোষণা। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী শ্রীদেবাশিস রায় গতকাল রোম নগরীতে অকস্মাৎ পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো মাত্র··· !

চেতনা-রহিত হয়ে স্মরিতা ঐ মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা শোনে। অসহ্য যন্ত্রণার প্রদাহে ওর সারাটা সত্তা যেন নীলায়িত হয়ে পড়ে। অনেক চেষ্টা করেও স্মরিতা নিজেকে সামলাতে পারে না। মনে হয়, ও যেন আর নিজের ভার বইতে পারছে না। পারছে না উদ্বেল হৃদয়ের বহতা কান্নাকে প্রতিরোধ করতে। হয়তো এখনই ওর সব শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাবে। আর বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার দুরন্তবেগে ওর সমস্ত ব্যথা-বেদনা বেরিয়ে আসবে নোনা জলের শব্দিত রূপ ধরে। বেরিয়ে আসবে গভীরতম মর্মজ্বালার বাঙ্ময় স্বর হয়ে।

ঘুমের ঘোরে মিলি হঠাৎ কেঁদে ওঠে।

সম্বিৎ ফিরে আসে স্মরিতার। ছোট্ট শিশুর মুখে এগিয়ে দেয় সিক্ত স্তনসুধা। কিন্তু মিলির কান্না থামে না। বোধহয় স্বপ্ন দেখেছে মিলি। খুব বাজে কোন স্বপ্ন। কিম্বা—কিম্বা ছোট্ট মিলিও হয়তো বুঝতে পারছে ও আজ পিতৃহীন।

পিতৃহীন। কথাটা মনে আসতেই চমকে ওঠে স্মরিতা। মিলির

মুখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। মিলির মুখের ছায়ায় ও যেন কার গভীরতম প্রচ্ছায়া দেখতে পায়। মিলির কান্নার শব্দে ও যেন নিজের ব্যর্থ হৃদয়ের অশ্রুত কান্নাকেই অনুভব করে। মিলিকে বুকের আতপ্ত আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে ও।

মিলি আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসে। তারপর আবার ফিরে যায় ঘুম-পাড়ানি মাসী-পিসীদের আদুড়-কোলে।

সুরিতা কিন্তু মিলিকে ছেড়ে ওঠে না। ওর হৃদয়ের গভীর থেকে একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। সজল চোখের কোণ থেকে ঝরে পড়ে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রুকণা। সিক্তিত হয় ওর কোমল কঠোর বক্ষদেশ লবণাক্ত স্রোতধারায়।

আকাশবাণী কলকাতা। আমাদের তৃতীয় অধিবেশনের এখানেই সমাপ্তি। আমাদের ঘড়িতে এখন রাত এগারোটা বেজে এক মিনিট দুই সেকেণ্ড। জয়হিন্দ্।

সুরিতা হাত বাড়িয়ে রেডিয়োটা এবার বন্ধ করে দেয়। তারপর আবার মিলিকে বুকে আঁকড়ে ধরে চিন্তার রাজ্যে ফিরে যায়। ফিরে যায় নিজের ভুলে-ভরা অতীতের বেদনার্ত মহাসিন্ধুর তীরে।

ডক্টর দেবাশিস রায়—আমার মাসতুতো ভাই। গতকালই বিলেত থেকে ফিরেছে।

সুরিতা—নব বধূ সুরিতা মুখ তুলে তাকায় স্বামীর দৃষ্টি অনুসরণ করে। নমস্কার জানাতে গিয়ে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খায় ও। মুহূর্তে রক্তশূন্য হয়ে পড়ে ওর সারা মুখ।

নিজের চোখের ওপর আস্থা হারিয়ে যায়। কিছুতেই ও বিশ্বাস করতে পারে না এক রাশ বিক্ষুব্ধ বেদনা নিয়ে সামনের যে পুরুষটি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে—সে শিল্পী দেবাশিস রায়। ওর প্রাণ-প্রিয়তম দেবাশিস।

বাইরে তখন সানাইয়ের সঙ্গে চলছে মেঘের দ্বৈত সুর। সেই সঙ্গে বজ্রের ঘোর নিনাদ। একটা প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসের আসন্ন ছবি ভেসে ওঠে সুরিতার স্থবির দৃষ্টির সামনে।

অতীতের বুকে বিচরণ করতে গিয়ে সুরিতার দৃষ্টি ক্রমশঃ সচল হয়। হয় স্বচ্ছতর। শিল্পী দেবাশিসের দুরন্ত ভালোবাসার মধুর স্মৃতির পশরা ওর মনকে আচ্ছন্ন করে। ধূসর নীল মহাকালের সুর মূর্চ্ছনার মতো দেবাশিসের মদির আশ্লেষের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের ঘ্রাণ ওর মনকে নিবিড় বিষণ্ণতায় ব্যাকুল করে তোলে। দেবাশিসের দু চোখের অপরিমেয় মাধুর্য সুরেলা জল-তরঙ্গের মতো ওকে অভিভূত করে রাখে।

মধ্যরাতের গহন আঁধারে নিজেকে সঁপে দিয়ে রোমাঞ্চিত স্মৃতির রোমন্থন করে সুরিতা। অনিন্দ্যসুন্দরী তিলোত্তমা সুরিতা। শহরের নামী ব্যবসায়ী সনৎ ভট্টাচার্যের প্রিয়তমা পত্নী সুরিতা দেবী।

দেবাশিস, এমন করে বারবার আমার সুখের সংসারে তুমি প্রবেশ করো না।

সুরিতা, আজ তোমার কি হয়েছে বলো তো? কেউ কিছু জানতে পেরেছে কি?

কেউ কিছু জানতে পারাটাই কি সব, দেবাশিস?

তোমার কথার অর্থটা ঠিক বুঝতে পারছি না, সুরিতা।

আমি জ্বলছি, দেবাশিস। বিসুভিয়াসের দহনের চেয়েও তীব্রতর কোন দহন-জ্বালায় আমি প্রতিনিয়ত জ্বলছি। নিজের তৈরী একটা মারাত্মক অক্টোপাশের কঠিন পেষণে আমি নিজেকে চূর্ণ করে চলেছি প্রতিটি মুহূর্তে।

এসব কি বলছো তুমি? তুমি কি তবে সেদিন ভালোবেসে

আমার কাছে আত্মসমর্পণ করোনি? মিলি কি তবে আমাদের লালসার ফল?

মিলি! মিলির জন্যেই আজ আমাকে সবকিছু নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। গড়ে তুলতে হবে নিজেকেও। সব দিক থেকে ওকে বঞ্চিত রাখবো কেমন করে? আমি যে ওর মা, দেবাশিস!

তুমি ওর মা। আর আমি কি ওর জন্মদাতা নই?

তাহলে কেন তুমি বুঝতে চাইছো না, মিলি ক্রমশঃ বড় হচ্ছে? ওর শিশু-মনে এখন অনেক কিছুর প্রভাব একটা চিরস্থায়ী আশঙ্কার কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। ওর নিষ্পাপ জীবনটা একটা আকস্মিক জটিলতায় ক্ষত-বিক্ষত হতে পারে। তোমার সন্তানের ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা ভেবেও কি তুমি নিজেকে সংবৃত করে নিতে পারো না, দেবাশিস?

হ্যাঁ, দেবাশিস শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংবৃত করেই নিয়েছে। চিরদিনের জন্যে সে সরিয়ে নিয়েছে নিজেকে সুরিতার জীবন থেকে। হারিয়ে গিয়েছে আত্মজা মিলির জীবন থেকেও। কিন্তু—কিন্তু এ তো সুরিতা চায়নি। এমন করে—

সুরিতা আর সহ্য করতে পারে না। মিলিকে বুকে জড়িয়ে আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ও। ভেঙ্গে পড়ে নিজের অন্ধ ভুলের কথা স্মরণ করে।

ভুল? হ্যাঁ, ভুলই! নিঃসন্দেহে সুরিতা সেদিন ভুল করেছিলো। একটা মারাত্মক ভুল। নিজের হৃদয়কে চিনতে না পারার ভুল।

একান্ত মূর্খের মতোই সেদিন তার অথর্ব বিবেকের নির্মম যূপকাষ্ঠে দেবাশিসের ভালোবাসার সব দাবীকেও নিঃশেষ করতে চেয়েছিলো। নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিলো পঙ্গু সতীত্বের কদর্য মুখোশের আড়ালে। কিন্তু পারলো কি?

পারলো কি স্মরিতা দেবাশিসের বিরাজিত প্রেমের প্রসারিত শক্তিকে অস্বীকার করে আদর্শ সহধর্মিণীরূপে সনতের সংসারকে আলোকিত করতে ? পারলো কি ও তৃষিত যৌবনের অনির্বাণ দাবীকে অস্বীকার করে নিজের অন্তর থেকে প্রিয়তম দেবাশিসকে নির্বাসন দিতে ?

না, পারেনি। ও পারেনি দেবাশিসের একনিষ্ঠ প্রেমকে বিস্মৃতির সীমান্তে সরিয়ে দিতে। তার সব স্মৃতিকে মুছে ফেলতে নিরুত্তাপ ঔদাসীন্যে।

তাই প্রায় রাতেই ও স্বপ্ন দেখেছে। শৃঙ্গারের সোনালী স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখেছে, দেবাশিস ওকে গাঢ়তম আলিঙ্গনে নিবিড়ভাবে বেঁধে রেখেছে প্রেমের অতলান্ত নিষ্ঠা এবং অনন্ত ঐশ্বর্য দিয়ে।

নারী-হৃদয়ের সব দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে তখন স্মরিতা পৌঁছে যেতো স্বপ্নেয় মিলনের মহান স্বপ্নলোকে।

কিন্তু আজ বুঝি ওর সব স্বপ্ন-দেখা শেষ হয়ে গেলো !

আকাশবাণী কলকাতার ঐ নির্মম ঘোষণাটা জ্যা-মুক্ত শায়কের মতোই এসে বিঁধলো ওর কোমল বুকে। মুহূর্তে নিঃশেষ করে দিলো অতি যত্নে লালিত ওর প্রেমের স্বপ্নিল স্বপ্নটাকে।

দেবাশিস নেই। আর কোনদিন সে এসে দাঁড়াবে না অন্ধ স্মরিতার ক্লিন্ন জীবনে। প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আর কোনদিন সে ভরিয়ে দেবে না স্মরিতার বিরহদগ্ধ স্বত দেহটাকে। রাঙিয়ে দেবে না তার কবোষ্ণ যৌবনকে অমৃতসম্ভব তৃষ্ণার তক্ষণে। মাতিয়ে তুলবে না তাকে রূপালী রক্তের আলোক-অভিসারে প্রাগৈতিহাসিক দৃঢ়তায়। দেবাশিসের মৃত্যু স্মরিতার জীবন থেকে স্বপ্ন-প্রয়াণের সব প্রতিশ্রুতি নিঃশেষ করে দিয়েছে। মুছে দিয়েছে ওর জীবনের সব আশার আলো। নিক্ষেপ করেছে ওকে এক অতল অন্ধকার গহ্বরে।

স্মরিতা বুঝতে পারে এখন এই অতল অন্ধকার থেকে নির্গমনের

সব পথই আজ বন্ধ। ও বুঝতে পারে বেদনার অনলে পুঁড়ে বাকী জীবনটা এই নিঃসীম আঁধারেই পড়ে থাকতে হবে ওকে নিঃস্ব রিক্ত নারীত্বের কান্নাকে চির-সঙ্গী করে।

শিল্পী দেবাশিস রায়ের শোক-সভায় সেদিন আমিও উপস্থিত ছিলাম। শিল্পীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সূত্রে কিছু সুখস্মৃতির রোমন্থন করার সময়ে শিল্পীর ভ্রাতৃবধু শ্রীমতী স্মরিতা ভট্টাচার্যের বিষণ্ণ হৃদয়ের ভাষা বুঝতে আমার বিলম্ব হয়নি।

স্মরিতা দেবীর আর্ত হৃদয়ের অন্তহীন হাহাকার আমার মনকে আর্দ্র করে। ঝরে পড়ে আমার আন্তরিক সমবেদনা প্রেমের স্বর্গ থেকে নির্বাসিতা ঐ ক্রন্দসী নারীর জন্যে।

॥ ৪ ॥

শীতের সন্ধ্যা। অথচ কোথাকার কোন ঘূর্ণি ঝড়ের আকস্মিক আবির্ভাবে সারা আকাশের বুকে আসন্ন প্রলয়ের সুস্পষ্ট ঘণ্টাধ্বনি। সঙ্গে ক্ষণপ্রভার তীব্র তির্যক কটাক্ষ। যে কোন মুহূর্তে সুরু হয়ে যাবে ঝড়ো বাদলের প্রলয় নাচন।

দুর্যোগের পূর্বাভাষ পেয়ে ফ্লাইট দু ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং—

সুতরাং মলয় কিছু চিন্তিত হয়। চারপাশে তাকিয়ে কিছু জরিফ করতে চায়। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না।

আর পারবেই বা কি করে? চারদিকেই যে অন্ধকার। ঘন জমাট অন্ধকার। কে যেন মুঠো মুঠো অন্ধকারের কাজল-কালো আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে। ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশে। পার্থিব জগতে। সর্বত্র।

কতক্ষণ ধরে অন্ধকারের এই হোলিখেলা চলবে, কে জানে!

মলয় খুবই বিরক্ত হয়। মুখ দিয়ে কতকগুলো অশ্লীল শব্দ বেরিয়ে আসে আচম্‌কা ঃ

শালা, স্বাধীনতা না কচু। সব শালা চোর। সব শালা বদমাশ। বেইমান। লালমুখো ইংরেজগুলোর চেয়েও এই স্বদেশী শালারা আরও বেশি শয়তান। যত সব কুত্তার বাচ্চা!

কথাগুলো নিজের কানে যেতেই মলয় খুব চম্‌কে ওঠে। ও অবাক হয়ে যায়।

ও ভাবতে থাকে এইমাত্র যে কথাগুলো ও শুনতে পেলো সেগুলো ওর মুখ থেকেই বেরিয়েছিলো কিনা। এমন ধরনের অশালীন উক্তি করা ওর পক্ষে সম্ভব কিনা।

ভাবনাটা দানা বাঁধবার আগেই অন্ধকার হলের নিয়ন আলো-গুলো একসঙ্গে জ্বলে ওঠে। দীর্ঘ এক ঘণ্টার লোড-শেডিং শেষ হয়। অবসিত হয় চাপা চাপা অন্ধকারের বিষণ্ণ বিষাদ। আর প্রকৃতির অন্ধ প্রতিরোধ চূর্ণ করে এয়ার পোর্টের কুহেলি-ঘেরা পরিবেশ এক সময় মুখর হয়ে ওঠে অজস্র আলোর রোশনাইতে।

ঘড়ির দিকে তাকায় মলয়।

রাত সাতটা পনেরো। অর্থাৎ এখনও দেড় ঘণ্টা সময় পার করতে হবে ওকে। অবশ্য প্রকৃতিদেবী যদি কিঞ্চিত সদয় হন, তবেই। নচেৎ—

না, ও সব অলক্ষুণে কথা না ভাবাই ভালো। আর তাছাড়া প্রকৃতিদেবী মনে হচ্ছে একটু প্রসন্নতার দিকেই। বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃ কমে আসছে। আকাশের মুখেও দেখা যাচ্ছে স্মিত হাসির সলজ্জ আভা।

মলয় কিছু একটা করতে চায় এখন। যা হোক কিছু করে এই নিষ্প্রাণ সময়টা কাটাতে চায় ও। দীর্ঘতম অন্ধকারের সীমান্ত থেকে সুরভিত আলোর রাজ্যে ফিরে এসে মলয় খুবই চঞ্চল হয়ে ওঠে।

তাই মলয় এখন নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চায়। বিভ্রান্ত স্থবিরত্বের অচিকিৎস্য সীমান্ত পেড়িয়ে যেতে চায় ও।

মলয় হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। লাউঞ্জের বাইরে যাবার জন্যে ও কয়েক পা এগিয়ে যায়।

কিন্তু পর মুহূর্তে তাড়া-খাওয়া হরিণের মতোই দ্রুত ফিরে আসে নিজের জায়গায়।

দুহাতে মাথাটা ধরে বসে পড়ে ও।

একটা শিরশিরে রিক্ততার হিমেল স্রোত মলয়ের মেরুদণ্ড বেয়ে সোজা মগজে চলে আসে। একটা স্থবির আচ্ছন্নতা ঘিরে ফেলে ওর সমগ্র শরীরী চেতনা।

অবসন্ন চেতনায় মলয় বসে রইলো। আর বসে বসেই স্বপ্নের জগতে বিচরণের জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করলো ও।

মলয়ের মনে হয় বৃথাই ও এতদিন শান্তির সন্ধানে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছে। অথচ শান্তি চিরদিনই ওর ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গিয়েছে।

তবে কি—তবে কি পূরবী রায়ের মতো শান্তিও অ-ধরা?

নিশ্চয়ই। তা নইলে ভাগ্য এমন করে বারবার তাকে পরিহাস করবে কেন?

পৃথিবীটা গোল। কিন্তু তার পরিধিটা কি এতই ক্ষুদ্র যে মলয়কে আজ পূরবী কাউড়ের মুখোমুখী দাঁড়াতে হলো?

যে স্মৃতির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে মলয় একদিন সবকিছু ছেড়ে পথে বেড়িয়ে এসেছিলো, সেই নিষ্ঠুর স্মৃতিই আজ আবার তীব্রতর আকর্ষণে তাকে কাছে টানে কেন?

এ কী মর্মান্তিক পরিহাস!

বিধুর মলয়ের বিরাজিত বিষণ্নতাকে ঢেকে দিয়ে হঠাৎ অন্ধকার অতীতের বুক থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসে এক টুক্‌রো আলোর সফেন স্রোত।

সচকিত মলয় সহসা পৌঁছে যায় স্বপ্ন-প্রয়াণের স্বচ্ছ বহতায়।

ইডেন উদ্যানের ছায়াঘেরা নির্জন কোণ।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই বিশ-শতকী রোমিও এসে হাজিরা দেয় প্রিয়া-মিলনের মধুর বাসনায়।

অবশ্য জুলিয়েট তখনও নেপথ্যে।

সুতরাং একটা সিগারেট ধরিয়েই নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে হয় মলয়কে।

বসন্তের সায়াহ্ন। ঝিরঝির হাওয়ার সঙ্গে কিছু নাম-না-জানা ফুলের মিষ্টি-মধুর গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। আর রমণীয় প্রকৃতির মুকুলিত ঘ্রাণে মলয়ের সবুজ মনটা প্রধুমিত ধূপের মতো জ্বলে ওঠে। ও অধৈর্য হয়ে ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে থাকে।

কিছু পরেই হেলেনীয় হাসিতে সারা মুখ উদ্ভাসিত করে পূরবী এসে উপস্থিত হলো একখানা কমনীয় কবিতার মতো।

পূরবীর পড়নে হাল্‌কা রঙের কাশ্মীরী সিল্ক। সঙ্গে ম্যাচ করে আকাশী রঙের ব্লাউজ। কপালে একটা ছোট্ট টিপ। ফিকে নীল রঙের। এছাড়া সারা অঙ্গে অতি অল্প প্রসাধনের ছাপ। তা সত্ত্বেও পেলব যৌবনের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ওকে অপরূপা মনে হয় মলয়ের।

অভিভূত মলয় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অভিলষিত নারী-প্রতিমার দিকে প্রাগৈতিহাসিক তৃষ্ণার কবোষ্ণ আর্তি নিয়ে।

পূরবীর চোখে অস্বস্তির মেদুর ছায়া পড়ে। বিশেষ করে মুগ্ধ মলয়ের নীরবতা ওকে মোহিনী লজ্জার কাজল পড়িয়ে দেয়।

তবুও এই নিথর নীরবতা ভাঙ্গতে ওকেই অগ্রণী হতে হয়।

ঘাসের বুকে সোনালী শিশিরের মাধুর্য ঝরিয়ে পূরবী জিজ্ঞাসা করে :

কি হলো ? কথা বলছো না, কেন ?

তোমাকে দেখে বাক্‌হারা হয়ে গিয়েছি যে !

আমাকে কি আগে কখনো দেখোনি ?

দেখেছি।

তবে—

তবে এই ভুবন-মোহিনী রূপের রমণীয় দ্যুতি দেখে কি আশ মেটে, সখি?

তাহলে বেশ ভালো করেই দেখুন, মশাই। এই আমি মডেল হয়ে বসলাম।

সত্যি পূরবী, মডেল হবার মতোই তোমার চেহারা। ভাগ্যিস্ মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, দা ভিঞ্চি, গঁগা—ওরা কেউ বেঁচে নেই এখন!

থাকলে কি হতো, মলয়বাবু?

ওরে বাপস্, সে কথা ভাবতেই ভয়ে আমার গা ছম্‌ছম্ করে ওঠে।

যা ভাবতে ভয় পাও, তা ভাবো কেন, মলয়?

পূরবীর কণ্ঠে ঝরে পড়ে সহানুভূতির আশ্বাস।

মলয় বিচলিত হয়। আলোচনার সুর পালটে দেবার জন্যে বলে :

কেন ভাবি জানো? ভাবি তোমার এই মারাত্মক ফিগারের জন্যে!

এই অসভ্য, আবার!

আচ্ছা ফিগারের কথা বললেই অতো রেগে ওঠো কেন, বলো তো?

না, রেগে উঠবে না! তোমার ফিগার মানে তো ঐ সব অসভ্য কথার ফুলঝুড়ি।

কথাগুলো বলেই পূরবী লজ্জিত হয়ে পড়ে। ওর মুখে ছড়িয়ে পড়ে অস্তাচলগামী সূর্যের রক্তিম প্রতিবিম্ব।

মলয় পূরবীর এই সলজ্জ ভাবটা বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। মেজাজী সুরে গেয়ে ওঠে :

ওগো, কে তুমি মোর মনে রঙ্ লাগালে?
চাঁদের আলোয় মেঘের নীলে
কে তুলি বোলালে?

তুমি কি মোর প্রাণের মিতা
গানে গানে পরিণীতা
হৃদয় দিয়ে, হৃদয় নিয়ে সুরের কমল ফোটালে ?
ফুলেরই গন্ধে তোমারে পাই
পাপিয়ার 'পিউ-কাঁহায়'—
ধরণীর ধুলি সোনা হ'ল তাই
তোমার মধুর ছোঁয়ায় !
দূর আকাশের যত তারা
ডাকছে আমায় (মোর) ছুটি সারা ;
কেন এমন করে আপন হ'য়ে
তুমি আমায় কাঁদালে !

গান শেষ হয়। দরদী-গলায় গাওয়া গানের কথাগুলো যেন জীবন্ত আলো হয়ে পূরবীকে ঘিরে রেখেছিলো এতক্ষণ। ও সম্বিৎহারা হয়ে, তন্ময় হয়ে গান শুনছিলো।

পূরবী !

মলয়ের কণ্ঠের আশ্লেষ আবেগে পূরবীর তন্ময়তার ঘোর কেটে যায়। ও মুগ্ধ চোখে মলয়ের দিকে তাকায়।

মলয় ওর একটা হাত নিজের হাতের বাঁধনে নিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দেয়। উভয়ের নিবিড় আবেগ সঞ্চারিত হয় উভয়ের শরীরী সত্তায়।

গান কেমন লাগলো, বললে না তো ?

সব কথা কি বলে বোঝাতে হবে ? না বললে কি কিছুই বুঝতে পারো না ?

পারি, পূরবী। তোমার সব কথাই আমি বুঝতে পারি।

তবে ?

শুনতে ভালো লাগে যে!

গানটা তোমার লেখা?

না। এটা গীতিকার দিলীপ সরকারের লেখা।

ঐ যে যিনি রেডিওতে প্রায়ই গান করেন?

শুধু রেডিওতে গান করেন বললে ভুল হবে, পূরবী। দিলীপ সরকার একটা প্রচণ্ড প্রতিভার সূর্যতোরণ। দিলীপ সরকার শুধু একটা নাম নয়। একটা যুগ। যে যুগ আপন সৃষ্টির ঔজ্জ্বল্যে চির ভাস্বর। চির অম্লান। এক কথায় চিরন্তন।

কিন্তু তাঁর সম্পর্কে তেমন কোন—

পাবলিসিটির চমক সৃষ্টি করা তো শিল্পীর কাজ নয়, পূরবী। জাত-শিল্পী সৃষ্টি করেন মনের আনন্দে। হৃদয়ের মাধুরী ঢেলে একাত্ম হন অভিভূত রসিকের নির্বাক চেতনার সঙ্গে। সৃষ্টি হয় সুরের আনন্দলোক শিল্পী ও শ্রোতার মহতী-মিলনে।

দিলীপ সরকার খাঁটি শিল্পী। মনে-প্রাণে সত্যিকারের সুর-তাপস তিনি। তাই তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে ভারতভাগ্যবিধাতা শাহেনশা শাজাহানের তপ্ত অশ্রুর সঙ্গে গদি-আঁটা-পিঠে সওয়ারী বহনকারী মেহনতী রিক্সাওয়ালার তপ্ত স্বেদবিন্দুর অবিস্মরণীয় সমন্বয়-সাধন। অথচ, না থাক। পূরবী!

বলো, মলয়।

কি ভাবছো?

কিছু না।

তোমার বাবার শরীর এখন কেমন আছে, পূরবী?

একটু বেটার। তবে খুব সাবধানে থাকতে হবে। হার্টের ব্যাপার কিনা!

তোমাদের ফার্ম কে দেখছে তাহলে?

বাবার পার্টনার মিস্টার অরিন্দম কাউড়। কিন্তু এ সব কথা

এখন থাক মলয়। তোমার কথা বলো। চাকরী যোগাড় হলো?

না, এখনও কিছু হয়নি। চেষ্টা করে যাচ্ছি।

মলয়ের কণ্ঠে হতাশার বেদনা প্রতিফলিত হয়।

কিন্তু তোমার এ চেষ্টার শেষ হবে কবে, মলয়?

তোমার এ কথার অর্থ কি, পূরবী? তুমি কি তবে আমার ওপর আস্থা রাখতে পারছো না?

ছেলেমানুষি করো না, মলয়। আমি কি বলতে চাইছি তুমি ঠিকই বুঝতে পারছো।

না, পারছি না। অন্ততঃ আমার জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে তোমার কথার ভাবার্থতা ঠিক ধরতে পারছি না।

তুমি কি বলতে চাও তোমার এতগুলো ডিগ্রির বিনিময়ে সামান্য একটা কেরাণির চাকরীও তুমি জোটাতে পারছো না এই দু বছর ধরে? এটাই কি আমাকে বিশ্বাস করাতে চাও তুমি?

আমি কিছুই বিশ্বাস করাতে চাই না তোমায়, পূরবী। সমাজের উঁচুতলার মানুষ তোমরা। তোমরা কেমন করে বুঝবে নিচুতলার মানুষের হাজারো পরাজয়ের আত্মগ্লানির মর্মব্যথা!

শেষের দিকে মলয়ের গলাটা ভারী হয়ে যায়।

পূরবী লজ্জা পায়। মলয়ের মনের যে ক্ষতস্থানটা এতদিন অগোচর ছিলো সেটা এখন সুস্পষ্টভাবে ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ও মৃদুকণ্ঠে বলে:

আমি না বুঝে তোমায় আঘাত দিয়ে ফেলেছি। আমায় ক্ষমা করো, মলয়। শুধু এই কথাটা মনে রেখো—আমি তোমার পরিচয়েই পরিচিত হতে চাই। অন্য পরিচয়ে আমার কোন মোহ নেই।

আমি তা জানি, পূরবী।

তাহলে আর কখনো ঐসব কথা বলবে না, কেমন?

বেশ, তাই হবে। এখন থেকে তোমায় সমাজচ্যুতা রাজকন্যা বলবো, কেমন ?

মলয়ের কথার ঢঙে উভয়ের মনের মেঘ কেটে যায়। ওরা দুজনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে। প্রশান্ত নির্মল হাসি। সে হাসির স্বর্গীয় উচ্ছলতা তরঙ্গায়িত হয়ে ইডেনের জলকে ছল্‌কে দেয়।

এক্সকিউজ মি ! হোয়াটস্‌ দ্য টাইম প্লিজ ?

মলয়ের স্মৃতিচারণ ব্যাহত হয়।

প্রশ্নকারিণীকে সময়টা বলে একটা সিগার ধরায় মলয়। তারপর ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে আবার ফিরে যায় ও বিস্রস্ত অতীতের রাজ্যে।

এলোমেলো চিন্তার জটগুলো খুলবার চেষ্টা করে ও আপ্রাণ নিষ্ঠায়। চেষ্টা করে থরে থরে সাজানো স্মৃতিগুলোকে সংহত করবার।

কিন্তু পারে না। স্মৃতির ফুলগুলো দিয়ে কিছুতেই একটা গোটা মালা গাঁথতে পারে না ও।

মলয় ভাবতে থাকে কোনদিনই কি ও একটা গোটা মালা গাঁথতে পারবে না ? সারা জীবন ধরেই কি মলয়কে ভগ্নাংশ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে ?

অথচ একদিন সব প্রতিকুলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েই ও জয়ী হবার স্বপ্ন দেখতো। দুরন্তবেগে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার সামর্থ্য রাখতো।

আর আজ ?

আজ সেই প্রাণচঞ্চল মলয়ের সমস্ত অনুভূতিই মৃত। করোটি সম্বল অস্তিত্ব মাত্র। একটা বিবর্ণ জীবনের ব্যর্থ উত্তরাধিকারী ও। ওর আনন্দ-অবলীন জীবন আজ তাই স্বপ্নহীন। সর্বত্র শুধু বৈফল্যের হিমেল নেমেসিস।

নেমেসিস। হ্যাঁ নেমেসিসই। মলয় এটাকে নেমেসিসই বলবে। তা নইলে পূরবী সেদিন অমন করে তার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙ্গে দেবে কেন ?

এই কেন-র উত্তর খুঁজতে মলয় তলিয়ে যায় ভাবনার অতল সাগরে।

একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া চাকরীটা মলয়কে সেদিন কোন সময় দেয়নি। কাউড় ইণ্ডাস্ট্রীজের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের লোভনীয় মাইনেটা ওকে সেদিন দ্রুত টেনে নিয়ে গিয়েছিলো মীরাটে। মাত্র তিন ঘণ্টার নোটিশে।

না, কলকাতা ছাড়ার আগে পূরবীর সঙ্গে দেখা করার কোন সুযোগ হয়নি মলয়ের। বার দুয়েক চেষ্টা করেও পূরবীর বন্ধু দেবীকা মুখার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি ও। পারেনি এমন একটা আকস্মিক সৌভাগ্যের খবর পৌঁছে দিতে রায়বাহাদুর পুরন্দর রায়ের আভিজাত্যের অমর্যাদা না করে।

মীরাটে পৌঁছে কয়েকটা দিন কেটে যায় অস্বাভাবিক ব্যস্ততায়। তারই ফাঁকে একখানা দীর্ঘ চিঠি পাঠায় ও প্রিয়তমা নারীর উদ্দেশ্যে। ছড়িয়ে দেয় আপন হৃদয়-লাবণ্য চিঠির প্রতিটি ছত্রে।

তারপর অসীম আগ্রহে, অনন্ত প্রত্যাশায় কয়েকটা দিন অস্থিরতার নৈরাজ্যে বিচরণ করে ও উদ্বেল অন্তরে।

কিন্তু প্রতীক্ষা বিফল হয়। কোন উত্তর আসে না পূরবীর কাছ থেকে মলয়ের অশান্ত হৃদয়কে স্বপ্নলোকে পৌঁছে দিতে।

ক্ষুব্ধ অভিমানে মলয় আবার একটা চিঠি লেখে। বেশ মিঠে-কড়া ভাষায় সবকিছু তুলে ধরে নির্বিকার প্রেয়সীর কাছে।

সেই একই পরিণতি। দূর হয় না বিমনা বিষণ্ণ মলয়ের মূক-বেদনার অমানিশা।

মলয় এবার খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। ও আরেকখানা চিঠি লেখে। এবার আর দেবীকার হোস্টেলের ঠিকানায় নয়। সোজা রায়বাহাদুরের মার্বেল প্যালেসে।

চিঠিখানা পোস্ট করার পর মলয় অবাক হয় ওর দুঃসাহসিকতা দেখে। একটা ঝড়ো দুর্যোগের কালো অন্ধকার বিম্বিত হয় ওর স্বচ্ছ চেতনার প্রান্তে। একটা অন্ধ বিমূঢ়তায় আচ্ছন্ন হয় ও।

তারপর কয়েকটা দীর্ঘায়ত দিন অতিক্রান্ত হয় দুঃসহ যন্ত্রণায় ক্লেশে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে। অধীর উৎকণ্ঠায় চেয়ে থাকে ও নিয়ন আলোর ঘোমটা পরা কল্লোলিনী কলকাতার পানে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিঠির আশায় আর থাকতে হয়নি মলয়কে। রাজকন্যা নিজেই এসে উপস্থিত হলো একদিন।

সেদিনও আকাশে ছিলো এমনি সজল মেঘের মুখর মেলা।

সারাদিনের ক্লান্তি দূর করতে মলয় নিজেকে সঁপে দেয় কাব্য-জগতে।

সেলফ্ থেকে কবি দিলীপকুমার সাহার 'একটু নরম সুখ' বইখানা টেনে নেয় মলয়। খুঁজে নেয় 'আমার মৃত্যু এবং তারপর' কবিতাটি।

তারপর দরাজগলায় আবৃত্তি করে চলে ও বিধুর হৃদয়ের বেদনাকে ভুলে থাকবার অপস্রিয়মান প্রত্যাশায়ঃ

অবশেষে
এলো
সেই চরম মুহূর্তঃ নির্মম এই পৃথিবীর
রূঢ় রূপের মিনারে
নিজের শরীরী দেহটা
প্রস্তরায়িত করে

আমি
অন্তর্হিত হলাম
এক ধ্রুপদী জীবনের
বিরাজিত আশার
সফেন প্রত্যাশায়। এবং
অবসিত হলো
উদ্‌ভ্রান্ত রিপোর্টারের
অনুচ্চারিত কামনা
আমার
সৌর-সম্ভব আমেজী মৃত্যুতে।

এবং
ভূমিকাটা তৈরিই ছিলো। তৈরী ছিলো
জীবন জিজ্ঞাসার
সাল্‌তামামী। আর
পড়ন্ত বেলার কান্নার মতো
লোভনীয় হেডিংটাও
ম্যানেজমেণ্টের স্বীকৃতি পেয়েছিলো
বিষণ্ণ সম্পাদকের নিবিড় সমর্থনে।

তারপর
সংবাদপত্রের মহত্তম সংখ্যাটা
প্রকাশিত হলো
অবিলম্বে
বিয়োগান্ত শনেটের আকারে। এবং
ভোরের সূর্যের ঘ্রাণের মতো

বিমনা জন-মানসের কাছে
পৌঁছে গেলো
অতি দ্রুত
কবিকুলপতি দীপঙ্কর সাহার
অনন্ত যাত্রার বিধুর সংবাদ সহ
অয়নান্ত জীবনের
বিচিত্রতম
সচিত্র কাহিনী : অন্তরালে
তৈরী হচ্ছিলো
তখন
সম্ভাব্য মুনাফার ব্যালান্সসীট
স্কচ্ হুইস্কির
সফেন প্রতিশ্রুতিতে।
এবং
ঐশ্বর্যের
বর্ণালী ঔজ্জ্বল্য থেকে
চির-নির্বাসিত
চির-বিদ্রোহী
কবি দীপঙ্কর সাহার
ম্লান পাণ্ডুর জীবন-কাহিনী
রোমাঞ্চিত তুলির
নিপুণ টানে
হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশনের
কাঙ্খিত কামনাটা
যা
সুপ্ত ছিলো

এতদিন
স্টাফ রিপোর্টারের
নিভৃত চেতনায়
সফল হলো
সম্পাদকের
কবোষ্ণ কণ্ঠার
তির্যক কৃপায় : শিশির ভেজা শরতের
বিধুর কান্নার মতো
করুণতম প্রস্থটায়
অবগাহনরতা
দুজ্ঞেয়
দুর্জয়
বৈশালীর
তুষার ধবল যৌবনের
শরীরী দ্রাণ
পৌঁছে দেয়
রিপোর্টার চাকলাদারকে
স্বপ্ন-প্রয়াণের
শিথিল সীমান্তে।

তারপর
নির্মম
নির্বিকার
এই
পৃথিবীর
রূঢ় রূপের

সফেন সাগরে
প্রবাহিত হয়
বহু মুখর আলোচনার
নির্লজ্জ সমান্তরাল স্রোত : ভেসে যায়
নিঃস্ব
রিক্ত
কবি
দীপঙ্কর সাহার
সারা জীবনের
মহতী সঞ্চয়
ধনিক
বণিকের
স্পর্ধিত শোকসভায়।
অতএব
অনাঘ্রাত উষসীর
ধূপছায়া রঙে রাঙানো
আমার
স্বপ্নিল স্বপ্নটাও
শেষ পর্যন্ত
হারিয়ে গেলো
গাঢ়নীল আকাশের প্রলম্বিত অবক্ষয়ে।

আমার কবিতাগুলো কান্না হয়ে
ঝরে পড়লো মহাকালের বুকে।

আবৃত্তি শেষ হয়। মলয় হাত বাড়িয়ে আলোটা নিভিয়ে দেয়।

তারপর অবসন্ন দেহ-মন সঁপে দেয় কাউচের নরম বুকে। সঞ্চ-সমাপ্ত কবিতার রাজ্যে একটু নির্জন বিশ্রামের নিবিড় আশায়।

একটা নৈঃশব্দিক শূন্যতার মধ্যে কয়েকটা নিশ্চল মুহূর্ত পার-হয়ে যায়।

অকস্মাৎ একটা অতিপরিচিত পায়ের শব্দে মলয় চমকে ওঠে। অজানা এক পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে ও।

আলোটা জ্বেলে ও দ্রুত এগিয়ে যায় ওর ভাগ্যলক্ষ্মীকে সাদরে বরণ করতে।

পরক্ষণেই একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে দু পা পিছিয়ে আসে মলয়।

তীব্রতম এক বেদনায় ওর আশা ভগ্ন হৃদয়টা মুখ থুবড়ে পড়ে স্থির চিত্রের মতো।

অ্যাটেন্‌সন্‌ প্লিজ! প্যাসেঞ্জারস্‌ বাউণ্ড ফর ডেল্‌হি আর রিকোয়েস্টেড্‌ টু গেট দেম্‌সেলভস্‌ রেডি। ফ্লাইট নাম্বার টু টোয়েন্টি ওয়ান ইজ নাও রেডি ফর টেক অফ।

স্মৃতি-চারণায় ছেদ পড়ে।

এটাচী কেসটা হাতে নিয়ে সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্সের দামী অফিসার মিস্টার এম. কে. সেন ধীর পায়ে এগিয়ে যায় অতিকায় বোয়িংটার দিকে।

আর ওদিকে বাড়ি ফেরার পথে ক্যাটিলাগের নরম কাউচে হেলান দিয়ে মিসেস পূরবী কাউড় ভাবতে থাকে একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্যে কিছুই করতে পারলো না সে। অথচ—অথচ দেউলিয়া পিতাকে বাঁচাবার জন্যে—।

আর ভাবতে পারে না মিসেস কাউড়। গোপন ব্যবসাগুলোর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তীব্রতর এক বেদনায় ভেঙে পড়ে সে।

তারপর ?

তারপর আমাকে এখন বিদায় নিতে হবে।

কিন্তু তারপরের ঘটনাটা বলবেন তো? নাকি কৌতূহলটা চাড়িয়ে দিয়েই পালাবার মতলব ভাঁজছিলেন ?

শ্রীমতী অনিমা সেনের মন্তব্যে আমি চমকে উঠি। পরিবেশের গুরুত্ব অনুধাবন করে সতর্ক হাতে স্টীয়ারিং ধরি।

তারপরের ঘটনা পাবেন পুলিশের খাতায় এবং খবরের কাগজের পাতায়।

সে কী ? প্রিয়তমা নারীর এতবড় ক্ষতিটা—

সকলের বিবেকবোধ এক নয়, অনিমা দেবী! কিন্তু মলয়-পূরবীর অন্তরাগের কথা এখন থাক। বরং বেশ কড়া করে এক কাপ কফি খাওয়ান দেখি তাড়াতাড়ি। এক্ষুণি বের হতে হবে কিনা।

কোথায় ?

কোথায় আবার—মেসে।

কিন্তু সেজন্যে এত তাড়াতাড়ি কিসের, শোভনলালবাবু? সবে তো সন্ধ্যে ছটা এখন। নাকি অন্য কিছু—

সব কথা কি মহিলাদের বলতে আছে ?

শ্রীমতী সেন কিছু না বলে ভেতরে চলে যান। আর একটা চারমিনার ধরিয়ে আমি ধূমায়িত কফির স্বপ্ন দেখতে থাকি।

॥ ৫ ॥

শান্তভাবে সুশৃংখলভাবে জনতা ধীরে ধীরে চলে গেলো। কেউ এতটুকু উষ্মা প্রকাশ করলো না। সামান্যতম বিরক্তির মেঘ দেখলাম না কারুর মুখের কোণে। যেন সেনাপতির নির্দেশে সৈন্যগণ ফিরে গেলো আপন আপন ব্যারাকে সামরিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম কোন্ অদৃশ্য মন্ত্রগুণে জনতাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করলেন স্বামীজী মহারাজ! স্বামী প্রমথানন্দ। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী প্রমথানন্দ মহারাজ।

অবশ্য প্রশ্নের উত্তর পেতে বিলম্ব হলো না। ভ ঙ্গরা গ্রামের দু-চারজন কর্মী বন্ধুর সঙ্গে আলোচনার পর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামীজী মহারাজের ঐ অমোঘ মন্ত্রশক্তিকে আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারলাম। তারপর অভিভূত হয়ে গেলাম পরম প্রাপ্তির সামুদ্রিক মাহাত্ম্যে।

বন্ধুবর শ্রীমধুসূদন মিত্রের আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম পুরুলিয়ায়। শ্যামল সবুজ বাংলার সোনালী জীবনাবর্ত থেকে নির্বাসিত পুরুলিয়ায়। ঊষর রুক্ষ ঝলসানো রূপের বিড়ম্বিত ছায়া ধূসর পুরুলিয়ায়।

উঠেছিলাম মিশনের অতিথিশালায়। উদ্দেশ্য খবরের কাগজে পড়া মালথোড় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্রের বহু প্রশংসিত কর্মকাণ্ডের স্রোতধারা প্রত্যক্ষ করা। বিশেষ করে, স্বামী প্রমথানন্দের পৌরহিত্যে শিক্ষাজগতে চমকসৃষ্টিকারী মিশন বিদ্যাপীঠের এই নতুন কর্মযজ্ঞে গ্রাম বাংলায় যে অভাবনীয় সাড়া পড়ে গিয়েছে, তার অমৃত সৌন্দর্যের উৎস সন্ধান করা। বিশ্লেষণ করা এই অভিনব কর্মপদ্ধতির প্রকৃতিগত রূপরেখা।

উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য দুইই স্থির ছিলো। তাই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার শরীরী ক্লান্তি অস্বীকার করেই ওদের সঙ্গী হলাম। আশ্রমের শান্ত পরিবেশ ছেড়ে হাজির হলাম গ্রামীণ খেলার অনাড়ম্বর আসরে।

ফাইনাল খেলা।

বাঙ্গালীর অতিপ্রিয় ফুটবল খেলার ফাইনাল। প্রাক্ সূর্যাস্তের স্নিগ্ধ বহতায় ফুটবল রসিকদের জমাট আসর।

সোনা-ভরা হৃদয়ের কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশায় দুটি প্রতিদ্বন্দ্বি দল মুখোমুখি হয়। মেতে ওঠে ক্লান্তিহীন সংগ্রামে। খেলার পবিত্র অঙ্গণে ছড়িয়ে দেয় সুনিপুণ দক্ষতার অরূপ শিল্প-সুষমা। ছড়িয়ে দেয় ফুটবলের মোহিনী রূপকে সমর্থক এবং দর্শকদের অনুলিপ্ত মনে।

খেলা শেষ হয়। যোগ্যদলের জয়কে বিজিত দল স্বীকার করে নেয় অকুণ্ঠিত আন্তরিকতায়। বিজয়ী দল বেঁধে রাখে তাদের উষ্ণ সৌজন্যের কবোষ্ণ রাখী-বন্ধনে।

একটা পরিচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার সফল ব্যবস্থাপনার জন্যে উপস্থিত সুধীজনের সঙ্গে আমিও ভাঙ্গরা গ্রামের ক্রীড়া-সংগঠক এবং সুরভিত যুব-সমাজকে অভিনন্দিত করি।

শেষ পর্বে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন। মিশন কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে।

উপস্থিত জনতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে সেই পরম লগ্নের যখন নির্বাক রূপালী পর্দায় ভেসে উঠবে জীবন্ত মানুষের শব্দিত মিছিল। ভাঙ্গরা গ্রামের মেহনতী মানুষের আশাভরা কল্পনা রূপ পাবে ঐ ছোট্ট যন্ত্রের অজেয় শক্তির অপরিমেয় ঐশ্বর্যের বিস্মিত আলোকে।

ওরা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে অদূরে টাঙানো রূপালী পর্দার দিকে। ওদের সকলের চোখেই ফুটে ওঠে অখণ্ড আনন্দলোকের জন্যে অসীম ধৈর্যের সূর্য-ছবি।

কিন্তু অবস্থা প্রতিকূল।

অনলস চেষ্টা করেও সুধন্যবাবু, শৈলেনবাবুরা পারলেন না স্থবির পর্দার বিমনা বুকে চলমান জীবনের বিস্মিত অস্তিত্ব তুলে ধরতে। পারলেন না নিষ্ঠুর যন্ত্রের প্রচণ্ড প্রতিরোধকে জয় করতে নিজেদের সীমিত সামর্থ্য দিয়ে।

ওরা ব্যর্থ হলেন।

এমন অবস্থায় উৎগ্রীব জন-মনের একান্ত স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে আমি শিউড়ে উঠলাম! একটা খণ্ড-প্রলয়ের চিত্র সুস্পষ্ট চেহারা নিয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

এস ডি. ও. শ্রীতরুণ ভট্টাচার্য খেলা শেষে তাঁর পৌরহিত্য-বাণী দিয়েই বিদায় নিয়েছেন। বিদায় নিয়েছেন জরুরী কাজের জন্যে। আমাকে সঙ্গী হতে বলেছিলেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের সরল মনের মেলায় সওদা অসমাপ্ত রেখে আমি যেতে পারিনি।

এস. ডি. ও. সাহেব ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। শত হলেও পুরনো পরিচয়ের নির্ভেজাল ঘ্রাণ! তায় দীর্ঘদিন বাদে চার চোখের মিলন!

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে গেলেই ভালো করতাম। অন্ততঃ কর্মচঞ্চল কলকাতার সঙ্গে কর্ম-বিমুখ ভাঙ্গরা গ্রামের আঙ্গিক সৌসাদৃশ্যের ছবি দেখতে হতো না আমাকে দৈহিক এবং মানসিক লাঞ্ছনার বিনিময়ে।

এমনি নানা চিন্তার জালে জড়িয়ে পথ হারিয়ে ফেলছিলাম আমি।

এমন সময় ঘটনাটা ঘটলো।

মাইক-স্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়ে উনি চমক সৃষ্টি করলেন। শান্ত মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে উনি বললেন :

বন্ধুগণ, আমাদের ঐকান্তিক প্রয়াস নিষ্ফল হলো। অনেক চেষ্টা করেও এই পরাজয়কে আমরা এড়াতে পারলাম না। তবে আমরা এতে ভেঙে পড়বো না। আমাদের এগিয়ে যাওয়া থামবে না। আগামী কোনদিন নিশ্চয়ই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। আজকের এই ব্যর্থতার গ্লানি আমরা সেদিন মুছে দেবো রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত জীবনের কল্লোলিত স্রোতে। ঢেকে দেবো আপনাদের এই নৈরাশ্যের নিথর অন্ধকার সুনিশ্চিত সাফল্যে।

বন্ধুগণ, আপনারা এখন যে যার ঘরে ফিরে যান। আর যাবার আগে সকলে বলুন—আলস্য ছাড়ো, মেহনত করো।

আমাকে বিস্ময়-চকিত করে উপস্থিত জনতা স্বামীজী মহারাজের ডাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলে উঠলো :

আলস্য ছাড়ো, মেহনত করো।

তারপর স্বামীজীর নির্দেশ মতো 'জয় গুরু মহারাজ কী জয়' ধ্বনি দিতে দিতে সকলে ধীরে ধীরে নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলো।

আর নিজের অজ্ঞাতে আমার মাথাটা নুইয়ে পড়তে চাইলো ঐ সর্বত্যাগী মহাত্মার পদ-প্রান্তে।

॥ ৬ ॥

একাই বেরিয়েছিলাম।

ঘুরতে ঘুরতে মালথোড় গ্রামের স্বামীজী বাঁধের ধারে এসে দাঁড়ালাম।

স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম বাঁধটা-স্বামীজী মহারাজের আরেকটি চমক। শুধু এই একটিই নয়। এমনি আরো কয়েকটি বাঁধ উনি গড়ে তুলেছেন ছাত্র যুবক এবং স্থানীয় অধিবাসীদের অকৃপণ সহায়তায়।

উদ্দেশ্য খরা কবলিত গ্রামগুলির ঝলসানো দেহে বাঁধের জলসিঞ্চন করে তাকে সৃজনশীল করে তোলা। উন্নততর কৃষি-ব্যবস্থার সাহায্যে হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের বংশধরদের অন্ধকার জীবনে আলোর জোয়ার আনা। সোনালী ফসলের স্রোতে বদ্ধ অর্থনীতিকে গতিশীল করে তোলা।

স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীগোপাল চন্দ্র মাহাতো কথায় কথায় বললেন:

স্বামীজী মহারাজ পুরুলিয়ার মানুষের কাছে এক নতুন সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। দিয়েছেন আমাদের পঙ্গু অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলবার ডাক। আলস্য ছেড়ে কঠোর মেহনত করার ডাক। ঊষর মরুর গর্ভে জলস্রোত সন্ধানের ডাক। বন্ধুর মাটির রুক্ষ বুকে সোনা

কপাবার ডাক। এমন মানুষের ডাক কি কেউ না শুনে থাকতে পারে, শোভনলালবাবু?

না, পারে না।

আর পারে না বলেই রাজনীতির বন্ধন ছিন্ন করে এগিয়ে এসেছে নৃপেন মাজি। অর্থহীন আভিজাত্যের অহমিকা ত্যাগ করে ছুটে এসেছে প্রমথ মাজি। উচ্চ শিক্ষার মোহ কাটিয়ে নারায়ণ দেওঘরিয়া এসে দাঁড়িয়েছে স্বামীজীর পতাকাতলে। যাত্রাদলের জমাট আসর ছেড়ে মোহমুক্ত কঙ্ক মাহাতো নেমে পড়েছে ঘাম ঝরানো চাষের কাজে। এমন কি ভাঁটিখানার নিবিড় আলিঙ্গন থেকে বেরিয়ে এসেছে পাঁড় মাতাল প্রশান্ত হাজরাও।

সাড়া দিয়েছে আশেপাশের আরো বিশটা গ্রামের হাজারো মানুষ। উদার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ।

চির অবহেলিত চির হতমান পুরুলিয়া আজ জেগে উঠেছে। ট্রাক্টর 'রাজলক্ষ্মী' তার অসীম শক্তি নিয়ে আজ আঘাত করছে অনুর্বর জমিতে। ছিনিয়ে আনছে তার বন্ধ্যা বুক থেকে অনন্ত সম্ভাবনার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির আশ্বাস।

গোপালবাবুর কাজ থাকায় উনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

আমি বাঁধের পাড়ে বসে পড়ি। আর বসে বসে ভাবতে থাকি স্থানীয় জনগণের ক্রমবর্ধমান কর্মচাঞ্চল্যের স্বপ্নেয় সম্ভাবনার কথা।

একটা সর্বাত্মক বিপ্লবের সুনিশ্চিত সাফল্যের ঘ্রাণে আমার শঙ্কভরা হৃদয় ধীরে ধীরে পূর্ণ হতে থাকে।

একটা চারমিনার ধরিয়ে নেই। তারপর চারমিনারের মধুর আমেজে নিজেকে ছড়িয়ে দেই ঐ অনন্ত বিস্তৃত শ্যামল সবুজ প্রান্তরে।

হঠাৎ একটা ছোট্ট কচি নরম হাত ফিরিয়ে আনে আমাকে তন্ময়তার সীমান্ত থেকে।

তাকিয়ে দেখি মিষ্টি মেয়ে গুড্ডিসোনা।

গভীর মমতায় ওকে কোলে নিয়ে ওদের দিকে ফিরে তাকাই। ওদের অর্থাৎ গুড্ডিসোনার বাপী কবিবন্ধু দিলীপকুমার সাহা এবং ওর অন্যান্য সঙ্গীদের দিকে।

গুড্ডি জননী আচম্‌কা একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন আমার দিকে :

এত তন্ময় হয়ে কি খুঁজছিলেন, বলুন তো? বাঁধের কান্না নয় তো?

দিলীপ আমার সাহায্যে এগিয়ে আসে :

কি ব্যাপার? তুমি আবার হঠাৎ ওকে আক্রমণ করলে কেন?

আক্রমণ কোথায় দেখলে? তোমার বন্ধুটি সর্বত্র কান্নার শব্দ শুনতে পান কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম!

আমি শুধু হেসেছিলাম। কোন জবাব দেইনি।

জবাব রিনি দেবী নিজেই পেলেন। পেলেন পরের দিনই। পেলেন হুড্ডু ফল্‌সের মর্মর জলধারার অশ্রুত কান্নায়। রাঁচির মানসিক হাসপাতালের শব্দিত বেদনায়।

॥ ৭ ॥

রামবাবুর প্রস্তাবে আমরা সকলেই খুব উৎসাহিত হই।

গোপালবাবুর সময় নিষ্ঠার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তৈরী হয়ে নেই। তারপর তারাভরা আকাশের মোহন-রূপ দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চলি মিশনের প্রশান্ত সৌন্দর্যকে পেছনে ফেলে।

দীর্ঘপথ দীর্ঘতর হয় টায়ারের অবাধ্যতায়। ইঞ্জিনের দুঃসাহসিক ঔদ্ধত্যে। অবশ্য বিশশতকী পার্থ-সারথি রামবাবুর কড়া শাসনে চঞ্চল রথ শেষ পর্যন্ত আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌছে দিতে বাধ্য হয়েছে। মাঝপথ থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরতে হয়নি।

তাহলে হুড্ডু ফল্‌সের জলস্রোতে মীরা চৌধুরীর কান্না শুনতে পেতাম না কোনদিন।

মধুসূদনবাবুই শোনালেন সেই মর্মস্পর্শী দুর্ঘটনার কাহিনী।

তরুণ ইঞ্জিনীয়ার রঞ্জন চৌধুরী এসেছিলো হুড্ডু ফলস্‌ দেখতে। সঙ্গে সুন্দরী স্ত্রী মোনালিসা মীরা। সদ্য-বিবাহিতা মীরার তন্বী-দেহে তরঙ্গায়িত যৌবনের অপরিমেয় প্রাচুর্য-সম্ভার। প্রাচুর্যের সুষমা প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা ওর মনের সর্বত্র ভূগোলে।

এছাড়া ছিলো সহকর্মী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু মানস সিংহ।

হুড্ডু ফল্‌সের নয়ন-বিমোহন সৌন্দর্য, তার হিন্দোলিত যৌবনের তরঙ্গশোভা, তার কল্লোলিত কণ্ঠের উচ্ছ্বল সুর-মূর্চ্ছনা মীরার শবরী মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তীব্রতর আকর্ষণে।

রঞ্জন এবং মানসের নিষেধ অমান্য করে মীরা ক্রমশঃ নিচের দিকে নামতে থাকে। উঁচু-নীচু পিচ্ছল পাহাড়ী পাথরের ওপর দিয়ে চঞ্চলা হরিণীর মতো, বিভ্রান্ত পতঙ্গের মতো এগিয়ে চলে ও। গাইডের সাহায্য ছাড়াই।

বিমূঢ় গাইডকে দ্রুত এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেয় রঞ্জন। তারপর ইঙ্গিতে মানসকে অনুসরণ করতে বলে ও নিজেও নিচে নামতে থাকে দ্রুততর গতিতে।

মধুসূদনবাবু একটু থামেন। দিলীপের কাছ থেকে দেশলাইটা নিয়ে একটা সিগারেট ধরান।

চেন-স্মোকার হিসেবে দিলীপ এবং আমার সুনাম সর্বজনবিদিত। কাজেই জ্বলন্ত কাঠিটার সদ্ব্যবহার করে নেই আমরা দুজনে সময় নষ্ট না করে।

স্মৃতিশক্তিটাকে একটু চাঙ্গা করে নিয়ে মধুসূদনবাবু আবার ফিরে যান নিজের কথায়ঃ

তারপরই ঘটে সেই মর্মস্পর্শী ঘটনাটা!

স্ত্রীকে খরস্রোতা হুড্ডুর করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করতে রঞ্জন ঝাঁপিয়ে পড়ে হুড্ডুর বুকে।

আরম্ভ হয় প্রতিকূল স্রোতের সঙ্গে রঞ্জনের অমানুষিক লড়াই। অসীম শক্তিতে সে রাক্ষুসী স্রোতস্বিনীর সমস্ত পরাক্রম খর্ব করে দেয়। সে জয়ী হয়।

তারপর মীরার অচেতন দেহটা বুকে আঁকড়ে তীরের দিকে এগিয়ে আসে রঞ্জন। স্ত্রীর দেহটা তুলে ধরে উৎকণ্ঠিত মানসের দিকে।

মানস সঙ্গে সঙ্গে অচেতন মীরাকে ওপরে তুলে নেয় গাইডের সাহায্যে। তারপর একটা হাত এগিয়ে দেয় বন্ধুর দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কালান্তক ঢেউ এসে রঞ্জনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় নিরুদ্দেশের পথে।

'রঞ্জন'—বলে একটা বুকফাটা চিৎকার করে মানস জলে ঝাপিয়ে পড়তে যায়।

কিন্তু গাইড ওকে ধরে ফেলে। বলে ঃ

নংকা আলোম দিক দিকা বাবু। উনিকে আর বায় ঞামো আঃ। উনিকে রাক্ষুসী হূড্ডু উৎ কেদেয়ায় ঞুতোঃ কানা মুই। কুড়ি গীদরাকে ইদি কাতে অড়াঃ চালাঃ মে।

মধুসূদনবাবু থামতেই দিলীপের ছোট বোন জয়া বলে ওঠে ঃ

তারপর কি হলো মধুসূদনদা ?

প্রশ্নটা শুনে মধুসূদনবাবু কিছু বলবার আগেই জয়ার মেজদা দীপক ওকে সাবধান করে দেয় ঃ

গল্প শোনার নেশায় তুই আবার যেখানে সেখানে পা ফেলিস না। তাহলে তোকে সামলাতে গিয়ে আমরাই আবার গল্প হয়ে যাবো।

ছোরদার কথায় জয়া ভীষণ রেগে যায়। গুড্ডিসোনাকে আদর করতে করতে জবাব দেয় ঃ

আমার জন্যে তোকে অত ভাবতে হবে না। তুই নিজে বরং একটু দেখে শুনে পথ চল্।

ওদের ভাই-বোনের খুনসুরী থামাতে শেষ পর্যন্ত আমিই এগিয়ে যাই ঃ

মধুসূদনবাবু, যদি কিছু মনে না করেন তো পরের অংশটুকু আমিই বলি।

না না। এতে মনে করার কি আছে? আর তাছাড়া পরের কোন ঘটনা আমি যে জানিই না।

আমি জানি। কারণ, মানস আমার পরিচিত। বেশ কিছুদিন আমরা একসঙ্গে মশা আর ছাড়পোকার সঙ্গে লড়াই করেছি।

আমার কথায় সকলেই হেসে ওঠে।

অবশ্য দিলীপ ওর স্বভাবসিদ্ধ ফোড়নটা থেকে আমাকে রেহাই দেয় না। হাসতে হাসতেই বলে ফেলে :

তার মানে দুজনেই শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের রাখালত্বে মেষীয় জীবন কাটাতে এক সময়, কি বলো!

না, তুমি দেখছি ণত্ব-বিধির মতো ষত্বেও সমান কাঁচা।

হ্যাঁ, অনেকটা তোমার লেখার মতো!

আচ্ছা, তোমরা দু-বন্ধুতে কি আরম্ভ করলে বলো তো? শোভনলালবাবু, আপনি আরম্ভ করুন তো।

রিনিদেবীর কণ্ঠে রীতিমতো ধমকের স্বর।

আমি স্মিতহেসে ওদের দিকে তাকাই।

দেখি ওরা সকলেই গল্পের নেশায় বুঁদ হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মায় দিলীপ পর্যন্ত।

কেবল গুড্ডিসোনা নিজের মনেই বক বক করে চলে। দেড় বছরের বালিকা নিজের গল্পে নিজেই মেতে থাকে।

আমার মনকেও কি মাতিয়ে তোলে না?

॥ ৮ ॥

আত্মাকে নিপীড়ন করে কঠিন-কঠোর তপস্যায় ব্রতী ছিলো ক্রন্দসী মীরা। বিশাল বিশ্বের আনন্দলোক থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসিতা মীরা। অকালবৈধব্যের তীক্ষ্ণতম শায়কে আহত রক্তাক্ত মীরা।

রঞ্জন চলে যাবার পর দীর্ঘ তিনটি মাস কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময় মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে স্বামীর স্মৃতিকে বুকে আঁকড়ে বেঁচে থাকতে। সতর্ক পদক্ষেপে দুর্গম পথ অতিক্রম করতে। চেষ্টা করেছে নিস্পৃহ গাম্ভীর্যের শীতল কফিনে তার তপ্ত তাজা যৌবনের কান্নাকে লুকিয়ে রাখতে।

কিন্তু মীরা যে আর পারছে না। রঞ্জনের স্মৃতি যে ক্রমশঃ ধূসর হয়ে আসছে। অশক্ত বিবর্ণ স্মৃতি নিয়ে আর যে পথ-চলা যায় না। অপ্রতিরোধ্য মানসের প্রচণ্ড ভালোবাসার জোয়ারে ঐ মুমূর্ষু স্মৃতি যে স্থবির ফসিলের মতো হারিয়ে যেতে বসেছে অবসিত অতীতের অতল অন্ধকারে।

দেড় মাসের দাম্পত্য-জীবনের ভেজা-অধ্যায়টা মাঝে মাঝে চেতনার প্রান্তে ছায়া ফেলে। কিন্তু সে ছায়াটা নিষ্প্রাণ প্রবন্ধের মতো অকস্মাৎ মিলিয়ে যায় দিগন্তের আকাশে। মিলিয়ে যায় নিয়তি-নির্যাতিতা মীরার মানসিক বৈকল্য ঘটিয়ে।

তালতাল অন্ধকারের অশরীরী তৃষ্ণার ছায়ায় বিভ্রান্ত অসহায় মীরা এখন কি করে ?

মীরা আকাশের দিকে তাকায়।

দেখে পাণ্ডুর সূর্যটা বেঁচে থাকতে চাইছে আকাশের অনন্ত নীলিমায়। কিন্তু পারছে না। শ্রাবণ-মেঘের অফুরন্ত প্রাণ-শক্তির কাছে সে বারবার হেরে যাচ্ছে।

মীরা এবার দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে তাকায়।

দেখে জীবন-নাট্যের অমুজ্জ্বল অধ্যায় থেকে অপসৃত রঞ্জন চৌধুরীও ঐ পাণ্ডুর সূর্যের মতোই সংগ্রাম করছে বেঁচে থাকার অনির্বাণ বাসনায়।

কিন্তু ফুল-মালায় সুশোভিত নির্বাক স্থবির রঞ্জন কি পারবে সমুদ্র-সফেন মানসের উত্তপ্ত হৃদয়ের মুখর গন্ধকে প্রতিরোধ করতে ? পারবে কি প্রেমাঞ্জন-মাখা মানসের স্বপ্ন-সম্ভব মনের রোমাঞ্চিত আশাকে ঠেকিয়ে রাখতে ফ্রেমে-বাঁধানো স্বামীত্বের নিষ্প্রাণ দাবীতে ?

এমনি নানা চিন্তায় মীরার মন এলোমেলো হয়ে পড়ে। ওর বুকের গভীরতম প্রদেশ থেকে বেরিয়ে আসে একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস। চোখের প্রান্তে জমে ওঠে বিন্দু বিন্দু লবণাক্ত জল নিঃসঙ্গ-নিপীড়িত নারীর আর্ত-কান্নার প্রতীক হয়ে।

মীরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় রঞ্জনের ছবিটার দিকে। কয়েকটা নিশ্চল মুহূর্ত অতিক্রান্ত হয় সুখস্মৃতি রোমন্থনে। তারপর ভেজাগলায় ও গাইতে থাকে ফিল্মী দুনিয়ার সাড়া-জাগানো শিল্পী এবং গীতিকার মৃণাল চক্রবর্তীর কান্না-জড়ানো গানটা :

যে ছিলো আমার শুধু আমার হ'য়ে
কি করে আমায় সে ভুলতে পারে
আমি কেমনে ভুলি তারে ?

আমাকে চেনার আগে ভুলে গেলে
এ মনেতে কি যে হয় বোঝাই কারে ? ॥

মনে তো পড়ে না কভু তোমাকে ভাবার আগে
আমার নিজের কথা তুলেছি—
এ বুকে তোমায় রেখে
আমার সকল ব্যথা ভুলেছি।
তুমি কাঁটার জ্বালা দিলে
ফুলের মাধুরী ভোলাবারে ॥

মন পুড়ে ছাই হ'ক তবু এ মন আমি
তোমার দেউলে শুধু জ্বেলেছি—
কি চোখে দেখেছি আমি
এ দু'চোখ দিয়ে তাও ব'লেছি।
তুমি বরণ করেছো কি গো
মরণের চিতা জ্বালাবারে ॥

মীরার হৃদয়-বেদনার বাঙ্ময় সুর-তর্পণ শেষ হয়। ও রঞ্জনের ছবির দিকে তাকায়। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই দেখতে পায় না। চোখের জলরাশি পথ-রোধ করে দাঁড়ায়। রঞ্জন ক্রমশঃ দূরে, আরো দূরে সরে যায়।

হঠাৎ একটা গুরুগম্ভীর আওয়াজে মীরা চমকে ওঠে। এগিয়ে যায় জানালার ধারে। তারপর খোলা জানালা দিয়ে ও আকাশের দিকে তাকায়।

দেখে ঝড়ো দমকা বাতাসের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল মেঘের দল ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশের বুকে বলদর্পী মেজাজে। মুঠো মুঠো জোলো হাওয়া বইছে ঝিরঝির করে।

শিথিল দেহে মীরা দাঁড়িয়ে থাকে জানালার গরাদ ধরে।

মেঘের সাম্রাজ্যলিপ্সা ক্রমশঃ তীব্রতর হয়। গভীরতর হয় তার বিস্তার। অসীম হয় তার শব্দিত গর্জন। আর অন্তর্হিত সূর্যের ক্রমিক অবক্ষয়ে বিপর্যস্ত আকাশ সহসা ভেঙে পড়ে নিঃসীম কান্নায়।

মীরা জানালার ধার থেকে একটু সরে আসে। তারপর জানালাটা বন্ধ করবার জন্যে হাত বাড়ায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে এক ঝলক আলোর তীব্রতর কষাঘাতে মীরার সারা দেহটা থরথর করে কেঁপে ওঠে। শৃঙ্গাররত নারীত্বের সোনালী উত্তোরণে ওর শিথিল দেহের উপত্যকায় আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে যায়। ছড়িয়ে পড়ে গলিত লাভার অগ্নিদাহ ওর বিষণ্ণ হৃদয়ের উদ্‌ভ্রান্ত শিরায়।

সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে মীরা ছুটে যায় এটাচ্‌ড বাথে।

শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে আয়নায় বিম্বিত নারীমূর্তির মুখোমুখি হয় মীরা। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে তার নগ্ন-সৌন্দর্যের বর্ণালী মহিমা।

কি দেখছো?

তোমাকে।

আমাকে দেখবার কি আছে?

নেই? কি বলছো তুমি? এমন অপরূপ রূপের পশরা সাজিয়ে রেখেছো তোমার দেহে যে দেখে আমার আশ মিটছে না। শুধু চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে।

মিথ্যে কথা। আমি আর দশটা নারীর মতোই সাধারণ। অতি সাধারণ।

না। তুমি অসাধারণ। তুমি অনন্যা। তুমি তিলোত্তমা। তোমার অনন্যসাধারণ দেহকান্তিতে নায়িকা-সদৃশ আশ্চর্য দ্যুতি।

আচ্ছা আমার মধ্যে অসাধারণ কি দেখলে তুমি, বলো তো ?

কি দেখলাম ? দেখলাম দুধে-আলতায় গোলা তোমার ঐ বরতনুতে বাঁধ-ভাঙা তিস্তার মতো অফুরন্ত যৌবন-বন্যার প্রদীপ্ত প্রকাশ। কাজল-কালো কুঞ্চিত কেশে চিত্তহারী প্রাচুর্য। আয়ত-আঁখির সীমান্তে কমনীয় কটাক্ষ। মরাল গ্রীবার সঙ্গে সুসংহত তোমার নরম অধরের সুরম্য সৌন্দর্য। প্রলম্বিত বাহুযুগলে অনন্ত ঐশ্বর্যের উদ্দাম উচ্ছ্বাস। ঐশ্বর্যের এই উদ্দাম উচ্ছ্বাসই তরঙ্গায়িত নিতম্ব পার হয়ে বড় বড় কুণ্ডলীতে সুছন্দিত হয়েছে। তোমার রক্তিম ওষ্ঠের ফাঁকে ছড়িয়ে আছে মনোলোভা মোনালিসার লীলায়িত হাসির অনুপম স্নিগ্ধতা। তুষার-ধবল বক্ষের বিরাজিত প্রচ্ছদে স্বর্ণাভ-সুন্দর সুডৌল-সুকোমল স্তনশঙ্খ ভোরের সূর্যের মতোই সমুদ্র-সম্ভব। হিন্দোলিত স্তন-শিখরের কৃষ্ণবর্ণ মণিতে দ্যুতিময় ছন্দ-সুষমা। তোমার চঞ্চল চরণের মদির নিক্কন আত্মহারা পুরুষের হৃদয়ে আনে নুপূরের সুরেলা ঝঙ্কার। তোমার উর্বশী-যৌবনের অপরিমেয় ঐশ্বর্যের কবোষ্ণ সান্নিধ্যের কামনায় জর্জরীত হয় বিভ্রান্ত পুরুষের বাসনা-তপ্ত রক্তাক্ত হৃদয়।

থাক থাক। হয়েছে। বর্ণনার কি ভাষা! যত সব কথার ফুলঝুরি!

একবার মানসের চোখ দিয়ে দেখো, তাহলেই—

চুপ কর। চুপ কর মুখপুড়ী। এ সব কথা শোনাও যে আমার পাপ। আমি যে—আমি যে বিধবা।

বৃথা আত্ম-প্রতারণা করো না।

আত্ম-প্রতারণা ?

হ্যাঁ, আত্ম-প্রতারণা। বৈধব্যের বর্বর শাসনে তৃষিত আত্মার অস্তিত্বকে নির্মূল করা যায় না। যায় না উপবাসী নারীত্বের স্বাভাবিক শরীরী দাবীকে অস্বীকার করা। মনে রেখো যুগ পাল্টে

গেছে। পাল্‌টে গেছে নোনাধরা সতীত্বের পুরনো সংজ্ঞা। ভুলে যেও না জীবন নিতান্তই ছোট। যৌবন আরো ছোট। আরো ক্ষণস্থায়ী। তাই আজকের যুগে কোন নারীর পক্ষে অচল পাহাড় হয়ে থাকাটা হাস্যকর মূর্খতা। আর দেরী করো না। মানসের ডাকে সাড়া দাও। তাকে বাঁচাও। বাঁচাও তোমার কাঙ্ক্ষিত নারীত্বকে। তোমার সবুজ সতেজ সতীত্বকে।

রক্ত-মাংসের মীরা এবার অস্ফুট হয়ে পড়ে অবসন্ন ক্লান্তিতে। কোন উত্তর খুঁজে পায় না ও। শুধু অনুভব করে ও হেরে যাচ্ছে। হেরে যাচ্ছে মানসের কালঞ্জয়ী প্রেমের দুঃসাহসিক দাবীর কাছে। তার অসীম প্রতীক্ষার রোমাঞ্চিত ঔদার্যের কার্যে।

মানসের এই মহত্তম ভালোবাসার মাধুর্যকে মীরা কেমন করে অস্বীকার করবে? কেমন করে অস্বীকার করবে মনের আকাশে ছড়িয়ে থাকা ওর সমুজ্জ্বল ধ্রুপদী সুরকে?

কলিং বেলের কর্কশ শব্দে মীরার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়। নিজেকে সংবৃত করে বেরিয়ে আসে বাথরুম থেকে।

আগন্তুকের পরিচয় পাবার পর আকস্মিক দৌর্বল্যে মীরার সমস্ত স্নায়ুকেন্দ্র অবশ হয়ে পড়ে। কোন রকমে দরজাটা খুলে দিয়েই সে সোফায় আছড়ে পড়ে বিধুর মর্মবেদনায়।

মানস ঘরে ঢোকে। মুখোমুখি হয় অশান্ত ঝড়ের আঘাতে বিপর্যস্ত বেদনার্ত মীরার।

মীরার দৃষ্টি ক্রমশঃ স্বচ্ছ হয়। ও মুখ তুলে স্থিরভাবে তাকায়।

দেখে প্রগাঢ় ভালোবাসার অঞ্জলি নিয়ে মানস এসে দাঁড়িয়েছে ওর বিধুর হৃদয়ের সদর দরজায়। দু চোখে তার অন্ধ দেবতার আতপ্ত পরশ।

মীরার ভেতরকার শাশ্বত নারী সত্তার সব পরাগ একে একে

শিথিল হয়। মুছে যায় ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক-বিধির অথর্ব-বর্বর অনুশাসন। মনের গহন অরণ্য থেকে মুহূর্তে মিলিয়ে যায় তিন মাসের বেদনার মহাবৃক্ষ। ওর সারা অন্তরে ছড়িয়ে পড়ে মহানন্দের প্লাবিত স্বপ্ন-স্বাদ।

অব্যক্ত একটা আবেগের তক্ষণে সমর্পিতা মীরাকে বিলীন করে দেবার জন্যে মানস ওকে বেঁধে ফেলে নিবিড় আলিঙ্গনে।

দেহের বন্ধনে উভয়ের দেহেই উত্তাপের আগুন ধরে যায়। সংযম টুটে যায়। সবকিছু ভেদ করে যৌবন-বেগ তীব্রতর হয় অজানা এক মহাদেশের আশ্লেষ আকর্ষণে।

স্খলিত হয় মীরার নারী-অঙ্গের পুষ্পস্তবক। মানসের দৃষ্টির সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে ওর চিরন্তনী নারীত্ব অপরূপ মহিমায়।

মর্মর ফলকের মতো মসৃণ কোমল রক্তাভ স্তনযুগলের সুউচ্চ শিখরে মানস এঁকে চলে তার সুনিবিড় আর্তির গাঢ়তম প্রণয়-চিহ্ন।

মীরার জীবনের অন্ধ গলিটা এতদিন বাদে আলোয় ঝলমল করে উঠলো বুঝি!

আমি থামতেই রিনি দেবী বলে ওঠেন :

কী আশ্চর্য! আপনার বিশ-শতকী বেহালায় মিলনের সুর?

আমার কথা এখনো শেষ হয়নি, রিনি দেবী।

ওরা সকলেই আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

নিঃশেষিত সিগারেটের আগুন থেকেই ধরিয়ে নেই আরেকটা চারমিনার। কিছুটা সময় কাটিয়ে দেই ধোয়ার রিং করে। তারপর ফিরে যাই পুরনো প্রসঙ্গে :

মীরার জীবনে মানসের আবির্ভাব কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুখকর হয় না। প্রেমের নিবিড় অঞ্জন এক সময় অস্পষ্ট হয়ে আসে মানসিক

দ্বন্দ্বের ক্রমিক অস্থিরতায়। বিশেষ করে, মীরার গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে রঞ্জনের অসীম সর্বব্যাপী উপস্থিতি মানসের প্রণয়-পদ্মকে অকালে ঝরিয়ে দেয়। উদার চরিত্রের মানস অনেক চেষ্টা করেও একটা স্বাভাবিক সত্যকে স্বীকার করতে পারে না আপন হৃদয়ের ঔদার্যে।

মানস মাঝে মাঝে হিংস্র হয়ে উঠেছে। সব কিছুকে মীরার ছলনা বলে মনে করে ওর প্রতি কদর্য কটূক্তি করেছে। এমন কী কয়েকবার গর্ভপাতের চেষ্টা করতেও দ্বিধা করেনি সে। কিন্তু প্রতিবারেই সে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে সদা-সতর্ক মীরার কঠিন প্রতিরোধের কাছে।

মানস ক্রমশঃ বুঝতে পারে প্রেমময়ী নারী ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছে মমতাময়ী মায়ে।

আর মীরার এই আকস্মিক রূপান্তরটাই শেষ পর্যন্ত ওদের জীবনে বয়ে আনে সর্বনাশের চরম পরিণতি।

মীরাকে নার্সিং হোমে পৌঁছে দেবার পরই মানস তার শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। নিজেকে সরিয়ে নেয় এই বিশ্বরূপের খেলাঘর থেকে।

আমি থামি। চারমিনারের ওষ্ঠে শেষ চিহ্ন এঁকে দিতে দিতেই রামবাবুকে তৈরী হতে বলি। কেবল রামবাবুর সহকারী শ্রীমান বংশী মাথা চুলকাতে চুলকাতে প্রশ্ন করে আমায় ঃ

মীরা মাঈজির বাচ্চাটার কি হলো তারপর, বাবু ?

ওর কথায় আমি হেসে ফেলি। হাসতে হাসতেই বলি ঃ

তোমার কথার জবাব দিতে হলে যে আমাকে সিনেমা-স্টার রেখা সিংহের বাড়ি ছুটতে হবে আবার। সেটা তো আজ আর সম্ভব নয়। কাজেই মীরা মাঈজীর বাচ্চাটার কথা আরেকদিন শুনো, কেমন বংশী ?

বংশী মাথা নাড়ে অভ্যেসের বশে। কিন্তু খুশী হয় না, সেটা বেশ বুঝতে পারি।

জীপের হুঙ্কার শুনতে পাই।

আমরা এগিয়ে যাই। লক্ষ্য রাঁচি।

॥ ৯ ॥

দুপুরের খাওয়াটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিলো।

কাজেই বিছানায় লম্বা হয়ে পড়লাম প্রথম সুযোগেই।

খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে নজর গেলো সুদূর আকাশের বুকে।

দেখলাম রাঁচির আকাশে নীলের ছড়াছড়ি। ফিকে নীলের পিয়ানো নয়। নয় ধুসর নীলের অর্কেস্ট্রা। বরং তানপুরার মিষ্টি মধুর ছন্দের মতো ঘন নীলের মদির স্বর-মূর্চ্ছনা। সেই সুরের আকাশে ছিলো প্রশান্ত সূর্যের স্নিগ্ধ আলো। আর সেই আলোই রাঙিয়ে দিয়েছিলো শীতের দুপুরকে উপাসনা মন্দিরের পবিত্র পরশে।

মনোরম প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যে মন ভরে উঠলো আমার। অসীম অনন্ত দিগন্তবিস্তৃত নীলাঞ্জনা আকাশের অতলান্ত রহস্যের ছবি আমার মনকে ঘরের বাইরে টানে সুতীব্র আকর্ষণে।

আমি উঠে পড়ি। চটপট তৈরী হয়ে নেই। তারপর সকলের অজ্ঞাতে বেরিয়ে পড়ি পা দুটির ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে।

একটু খুঁজতেই ওকে দেখতে পাই।

একটা পুতুলকে কোলে নিয়ে ও তেমনিভাবেই গান করে চলেছে। সেই একই গান। ঘুম-পাড়ানি গান ঃ

সোনা ঘুমলো পাড়া জুড়লো
বর্গী এলো দেশে ;
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দিবো কিসে ?
কিসের খাজনা কিসের বাজনা
খাজনার উপায় কি ?
আর কটা দিন সবুর করো
রশুন বুনেছি।

খুব আচ্ছা লোক তো আপনি! না বলে কয়ে পালিয়ে এসেছেন।

পালাতে আর পারলাম কই, মিসেস সাহা? ধরা পড়ে গেলাম যে!

কিন্তু হঠাৎ এখানে কি মনে করে?

বলতে পারেন একটা বোহেমিয়ান খেয়াল। যে খেয়াল আমায় তাড়িয়ে নিয়ে চলে মুঠো মুঠো কান্নার সন্ধানে!

কিন্তু কান্নাবিশারদ, সতেরো নম্বর সেলের এই রুক্ষা রূপসীর বিবর্ণ মুখের পানে চেয়ে তো এতক্ষণ চলার কথা দিব্যি ভুলে ছিলে তুমি! ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন লাগছে! একটু খোলসা করো তো ব্রাদার।

দিলীপের কথার ঢঙে আমি হেসে উঠি।

তারপর আস্তে আস্তে বলি :

সতেরো নম্বর সেলের রুক্ষা রূপসীর কথা এখন থাক, বন্ধু। তার চেয়ে তোমাদের একটা গল্প বলি, শোন।

গল্পের কথায় ওরা সবাই উৎকর্ণ হয়।

আর গল্পের সন্ধানে আমি ফিরে তাকাই মেণ্টাল হাসপাতালের চার দেওয়ালের সীমানার বাইরে।

॥ ১০ ॥

দিনান্তের ধূসর আঁধার ঠেলে ট্যাক্সিটা এগিয়ে চলে প্রশস্ত বি. টি. রোড ধরে।

আর নিঙ্‌ড়ানো দ্রাক্ষার পাণ্ডুর ঔদাস্যের মতো মাধুরী আধ-শোয়া অবস্থায় বসে থাকে। দু চোখে ওর গভীর উদ্বেগ উদ্বেলিত।

বাইরে তখন বৃষ্টি সুরু হয়েছে। ভরা-বাদলের মুখর বর্ষণ নয়। প্রশান্ত কার্তিকের সুস্নিগ্ধ বারি সিঞ্চন। সুরেলা জলতরঙ্গের মিষ্টি-মধুর ছন্দ-সুষমা। ঝিরঝির জলধারার রোমাঞ্চিত সুর বাহার।

সিক্ত শিরশিরে বাতাস মাধুরীর গায়ে আছড়ে পড়ে। শাড়ীর শাসন অস্বীকার করে বন্ধুর বুকের প্রচ্ছদ বারবার আত্মপ্রকাশ করে বিদ্রোহীর ভূমিকায়।

অন্তরের তলদেশ থেকে বেদনার পেয়ালাটা উপ্‌চে পড়ে বার-বার। বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে আসে একটা আর্ত দীর্ঘশ্বাস। বিষণ্ণ মনের জীর্ণ পর্দায় ভেসে ওঠে কতকগুলো আনন্দ-অবলীন শব্দিত ছবি।

আঃ! ডার্লিং, তুমি অপূর্ব! ঠিক যেন কবি কালিদাসের অভিজ্ঞা উর্বশী।

তুমি খুশী?

হ্যাঁ, খুউব। ভীষণ। মারাত্মক। দারুণ খুশী আমি।

তাহলে আমি যা চাইবো আজ, দেবে?

ওঃ শিওর। তুমি—তুমি যা চাইবে—শাড়ী, গয়না—

শাড়ী-গয়না আমার চাই না, গোয়েঙ্কাজী। আমি চাই টাকা। অনেক টাকা।

অনেক টাকা?

হ্যাঁ, অনেক টাকা। কি দেবে তো?

দেবো। বলো কত টাকা তোমার চাই?

পঞ্চাশ হাজার।

পঞ্চাশ হাজার!

হ্যাঁ, পঞ্চাশ হাজার।

এত টাকা নিয়ে কি করবে তুমি?

আমার বড় প্রয়োজন, গোয়েঙ্কাজী। পঞ্চাশ হাজার টাকার ভীষণ প্রয়োজন আমার। তুমি দেবে তো?

হ্যাঁ দেবো। কিন্তু একটা সর্তে।

বলো।

বাজোরিয়ার কোন ছবিতে তুমি কাজ করতে পারবে না। আর—আর আমি যখনই ডাকবো—

আমার এই দেহটা তোমার ভোগে দান করতে হবে, এই তো?

হ্যাঁ। কি রাজী?

রাজী। আমি রাজী, গোয়েঙ্কাজী।

একটা কচি বাচ্চাকে বাঁচাতে গিয়ে ট্যাক্সিটা আচম্‌কা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে।

শিখ ড্রাইভারের মুখ থেকে একটা অশ্রাব্য গালাগাল বেরিয়ে আসে মাধুরীকে সচেতন করে।

মাধুরী বিরক্ত হয় তার এই অশালীন উক্তিতে। তীব্রস্বরে ও এর প্রতিবাদ করে। লজ্জা পেয়ে পৌর ড্রাইভার মার্জনা চেয়ে নেয় ওর কাছে।

রিস্টওয়াচটা একবার দেখে নেয় মাধুরী। ছটা চল্লিশ। তার মানে এখনও দুটো ঘণ্টা হাতে আছে ওর। নিশ্চিন্তে বেদনার পেয়ালায় চুমুক দিতে থাকে ও।

বৈশাখী ঝড় শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সারা আকাশটায় যেন আলোর বান ডেকেছে। ভরা চাঁদের অসংবৃত যৌবনের ঢলে ভরে উঠেছে শিথিল বিশ্বপ্রকৃতি। আলোর রোশনাইতে ছেয়ে গেছে রোমান্টিক বিশ্বের কবোষ্ণ আঙিনা।

অজিতের ফেরার সময় হয়ে এসেছে। মাধুরী তাই এসে দাঁড়ায় জানালার ধারে।

কিছুক্ষণ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্যের দিকে। তারপর গুণ গুণ করে একটা গান গায় ও :

তুমি জানতে চেয়েছিলে
আমার মুগ্ধ চোখে চেয়ে
কেন এমন করে দেখি
তোমার চোখে এমন সে কি পেয়ে।

আমার পৃথিবী আকাশ
আমার জীবন মরণ
ও চোখে পড়েছে বাঁধা
আমার স্বপন জাগরণ
বোঝাবার মত ভাষা নেই
শুধু হৃদয় ওঠে গেয়ে ॥

যত দূরে যাই
কত নতুন ভাবনায়
হৃদয় যে তোমার
বারে বারে ছুঁয়ে যায়।
কতই যতন করে
নিজেকে দূরে সরাই
এ অপরাধের ছোঁয়া
পাছে তোমার লাগে তাই
যত গান যত সুরে গাই
সবই তোমার কাছে চেয়ে ॥

দরদী গীতিকার বেতারশিল্পী জটিলেশ্বর মুখার্জীর হিট্‌ গানটা মাধুরীর কণ্ঠ-সুষমায় সুরের প্লাবন আনে। গানের প্রতিটি কলিতে ঝরে পড়ে ওর প্রেমাঞ্জন-মাখা হৃদয়ের গভীরতম আর্তি। ঝরে পড়ে মহা-মিলনের শাশ্বত স্নিগ্ধতা।

এক অনির্বচনীয় আনন্দের শিহরণে ওর সারা দেহটা যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে।

আজ ওদের বিয়ের তারিখ।

আজকের এই মধুর দিনটিতে কাজে যেতে চায়নি অজিত। কিন্তু মাত্র পনেরো দিনের চাকরী-জীবন। তাই মাধুরী কিছুতেই ছুটি নিতে দেয়নি তাকে। জোর করে, বলা যায় ধরে-বেঁধে তাকে কারখানায় পাঠিয়ে দিয়েছে। অবশ্য মনের দিক থেকে একটুও সায় ছিলো না ওর।

কিন্তু কী করবে ও?

ভালোবেসে বিয়ে করেছে বলে অজিতের মাল্টিমিলিওনীয়ার বাবা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন। সমস্ত উত্তরাধিকার থেকেও

বঞ্চিত করেছেন তাকে। একজন রিটায়ার্ড হেড মাস্টারের মেয়েকে পুত্রবধূ করার কথা তাঁর যে কল্পনারও অতীত।

অতএব আরম্ভ হলো সংগ্রাম।

জীবন-সংগ্রাম। জীবনের হোম বহ্নিশিখা চিরন্তন প্রেমকে উর্ধ্বায়িত রাখার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম।

ভালোবাসার আগুনে শুচি হয়ে প্রায় একটা বছর ওরা তপস্যা করেছে। নিষ্করুণ বেকার-জীবনেও ওরা আলোর নক্শা এঁকেছে সোনা ভরা ভালোবাসার মধুর মাধুর্যে। ফুটিয়েছে ওরা হাসির সতেজ ফুল উষ্ণ যৌবনের স্নিগ্ধ লাবণ্যে।

ওদের পারস্পরিক নির্ভরতায় বিমুগ্ধ বন্ধুরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়েছে। বিস্মিত হয়েছে ওদের প্রেমের কালজয়ী শক্তি দেখে।

আসলে ভালোবাসার অনন্ত ঐশ্বর্যের দ্বারা ওরা দুজনে দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-দুর্দশাকে জয় করে নিয়েছিলো।

তাই ওরা পেরেছিলো বেদনার মহাসিন্ধু মন্থন করেও প্রেমকে অত্যুজ্জ্বল শুকতারার মতো তুলে ধরতে।

মাধুরীর মনে পড়ে ওদের প্রথম পরিচয়ের দিনটির কথা।

প্রিয়বান্ধবী অমিতার দাদার বৌ-ভাতের নেমতন্ন খেয়ে ফিরছিলো ও।

শ্যামবাজারের মোড়ে আসতেই মুষলধারে বৃষ্টি এসে গেলো। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে কোন রকমে বাস স্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছলো ও।

বাসের আশায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো মাধুরী।

কিন্তু সব বৃথা।

যে দু-একটা বাসের দেখা পেলো ও তাদের পা-দানিতে পা রাখার সাধ্যও ছিলো না ওর। এত প্রচণ্ড ভীড়। তার ওপর এই বৃষ্টি।

অথচ রাতও বেশ হয়ে গিয়েছে। প্রায় দশটা বেজে গিয়েছে। এত রাতে—এই দারুণ বাদলায় মাধুরী কী যে করে ভেবে পায় না।

অমিতার ওপর রাগ হয়। মিথ্যে এতক্ষণ আটকে রাখলো ওকে। যেন ওর গান না শুনলে দাদার ফুলশয্যাটা জমতো না। আর এখন যে মাধুরী বাড়ি ফিরতে পারছে না তার কী হবে ?

হঠাৎ মাধুরীর চিন্তার রাজ্য তরঙ্গায়িত হয়।

আরে আপনি !

মাধুরী চম্‌কে ওঠে। তাকিয়ে দেখে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে একখানা সুদৃশ্য মডেলের ক্রাইসলার। আর তারই দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে গাড়ীর একমাত্র আরোহী-কাম-ড্রাইভার ওকে ছুঁড়ে দিয়েছে ঐ প্রশ্নটা।

মাধুরী ভদ্রলোকটিকে চিন্‌তে পারে। উনি অমিতার দূর সম্পর্কীয় দাদা অজিতবাবু। আজই প্রথম আলাপ হলো ওর সঙ্গে। অমিতাই আলাপ করিয়ে দিলো।

একটু ইতস্ততঃ করে মাধুরী উত্তর দেয় ঃ

বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

চলুন, আপনাকে পৌঁছে দেই।

কিন্তু—

এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই মিস রায়। কারণ, আকাশের এবং বাসের যা অবস্থা, তাতে হয়তো সারাটা রাতই আপনাকে অপেক্ষায় থাকতে হবে। এর চেয়ে আমার গাড়ীটা অন্ততঃ বেশী নিরাপদ।

কিন্তু—

আবার কিন্তু ! নাঃ, আপনি দেখছি ঠাকুমা-দিদিমাদের যুগেই পড়ে আছেন এখনো। নিন্‌ উঠুন তো। কৈ উঠুন।

অজিতের কণ্ঠস্বরে এমন একটা যাদুকরী অথচ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলো যে, মাধুরী আর কথা না বাড়িয়ে গাড়ীতে উঠে বসেছিলো।

না, পেছনের সিটে নয়। সামনের সিটে। অজিতের পাশেই। অবশ্য দুজনের মাঝখানে কিছুটা ফাঁক রেখে!

কিন্তু ঐ ফাঁকটুকু কী মাধুরী রাখতে পারলো শেষ পর্যন্ত ?

না, ও পারেনি। ঐ ফাঁকটুকু বজায় রাখতে পারেনি ও। কখন যে নিজের অজ্ঞাতে মাধুরী নিজেই ঐ ফাঁকটুকু বুজিয়ে দিয়েছিলো ও নিজেও তা জানতে পারেনি।

যখন জানতে পারলো তখন ও শিউড়ে উঠলো। ভয় পেলো। ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় ওর অন্তরতর সত্তা হাহাকার করে উঠলো।

ভীতা মাধুরী চাইলো সবকিছু শেষ করে দিতে। সারাদিনের খেলা শেষে সূর্য যেমন হারিয়ে যায় অস্ত দিগন্তে, মাধুরীও চাইলো তেমন করে ওর প্রিয়তমের জীবন থেকে হারিয়ে যেতে। নিঃশেষে মিলিয়ে যেতে।

কিন্তু পারলো না।

অজিত ওর অভিনয় ধরে ফেললো। ওকে আরো কঠিনতর বাঁধনে আপন করে নিলো। অপরিমেয় ঐশ্বর্যের মায়া ত্যাগ করে প্রিয়াকে দিলো স্ত্রীর পবিত্র মর্যাদা।

অজিতের ক্রোড়পতি পিতা নানাভাবে চেষ্টা করলেন একমাত্র পুত্রকে একটা পথের মেয়ের কুহক থেকে ফিরিয়ে আনতে। তার ফাঁদ থেকে পুত্রকে উদ্ধার করতে।

কিন্তু পারলেন না।

শেষ পর্যন্ত ক্ষিপ্ত অবনীস হালদার মাতৃহারা পুত্রকে বঞ্চিত করলেন তাঁর উত্তরাধিকার থেকে।

অনেক বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে, অনেক যুদ্ধ জয় করে ওরা তাই আজ জয়ী। ওরা আজ সুখী। ওরা আজ সম্পূর্ণ।

এক গর্তে পড়ে ট্যাক্সিটা ভীষণভাবে আর্তনাদ করে ওঠে। মাধুরীর স্মৃতিচারণ ব্যহত হয়। ও ফিরে আসে বর্তমানের রুক্ষ রূঢ় নির্মম বহতায়।

মাধুরী চারপাশে তাকায়। কিন্তু রাস্তাটা ঠিক চিনতে পারে না। বোধহয় ট্রাফিক এবং ভীড়—এ দুটো এড়াবার জন্যে ড্রাইভার ঘুর পথে গাড়ি দিতে চেষ্টা করছে। ও নিশ্চিন্ত হয়।

মাধুরীর জীবনটা বুঝি অভিশপ্ত, তা নইলে সেদিনকার সেই মধুর সন্ধ্যাটা অমন করে ওর সবকিছু কেড়ে নেবে কেন? কেনই বা বিবাহ-বার্ষিকীর দিনটাই ওর জীবনে এনে দেবে এমন নিঃসীম শূন্যতা?

অনিচ্ছুক অজিতকে সেদিন জোর করে কারখানায় পাঠালো বলেই কী সে এমন করে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলো?

কিন্তু অভিমানী অজিত কী মাধুরীর অন্তরটা দেখতে পায়নি সেদিন?

ট্যাক্সিতে বসে মাধুরী ভাবতে চেষ্টা করে সেই ঘন কালো অভিশপ্ত রাতের কথা। সেই নিষ্করুণ অমারাত—যে রাতটা মাধুরীর বুকের ভেতর থেকে ওর একান্ত আপন-জনকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো।

অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনেই পাগলের মতো অজিতের সহকর্মীদের সঙ্গে ছুটে গিয়েছিলো ও।

কিন্তু তখন বড় দেরী হয়ে গিয়েছিলো।

মাধুরীর সব আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধি ঘটে গিয়েছিলো ততক্ষণে।

একটা বুকফাটা আর্তনাদ করে অভাগিনী নারী আছড়ে পড়লো নিথর স্বামীর দেহের ওপর। অশান্ত আবেগে মৃত অজিতের বুকে মাথা রেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো নিঃস্ব রিক্তা মাধুরী।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন অবনীস হালদার।

স্থান-কাল ভুলে ছেলেমানুষের মতো কান্নায় ভেঙে পড়লেন আভিজাত্য-গর্বী হালদার সাহেব।

মাধুরীর মতো অতি সামান্য একটা মেয়ের হাত ধরে বারবার অনুরোধ জানালেন পুত্রবধূর স্বীকৃতি নিয়ে হালদার ম্যানসনে থাকতে। পুত্রশোকাতুরা বৃদ্ধ শ্বশুরকে ক্ষমা করতে।

একে একে সব কথাই মাধুরীর মনে পড়ে।

মনে পড়ে, কেমন করে ঐশ্বর্যশালী অবনীস হালদারের ঐ লোভনীয় প্রস্তাবকে সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলো। মনে পড়ে, কেমন করে পরাভূত বিপর্যস্ত সেনাপতির মতো প্রত্যাখ্যাত অবনীস হালদার ক্লান্ত পায়ে ফিরে গিয়েছিলেন সেদিন একরাশ লজ্জা নিয়ে।

কিন্তু অবনীস হালদার আবার এসেছিলেন। এসেছিলেন দীর্ঘ এক বছর পর।

মহুয়ার তখন মাত্র সাত মাস বয়স।

কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়ে মাধুরী দরজা খুলে দেয়।

প্রথমটা ও খুব অবাক হয়ে যায়। মাত্র একটা বছরেই অবনীস হালদারের বয়সটা যেন অনেক বেড়ে গিয়েছে মনে হয়। মনে হয় তিনি যেন অকাল বার্ধক্যের শিকার হয়ে অনেকটা নুইয়ে পড়েছেন। বিশেষতঃ, মাথার চুলগুলো সব শাদা হয়ে যাওয়ায় তাঁকে আরো বেশী বুড়ো দেখাচ্ছিলো।

শ্বশুরকে প্রণাম করে মাধুরী। তারপর তাঁকে ভেতরে আসতে অনুরোধ করে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঘরের ভেতর প্রবেশ করেন বিধ্বস্ত অবনীস হালদার।

অপলকে ঘুমন্ত মহুয়ার পানে চেয়ে থাকেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে। তাঁর আর্ত হৃদয়ের গভীর থেকে আরেকটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে আসে অপত্যস্নেহের বিগলিত বেদনা চোখের জলের রূপ ধরে।

একবার দেওয়ালে টাঙানো অজিতের ফটোর দিকে, আরেকবার অজিতের আত্মজার দিকে তাকান তিনি।

সবকিছু সাদা চোখে দেখতে চাইলেন তিনি। চাইলেন সবকিছু হৃদয় দিয়ে বুঝতে।

কিছু হয়তো পারলেন। কিন্তু বেশীটাই রয়ে গেলো তাঁর নাগালের বাইরে।

তাই সেদিনও তাঁকে ফিরে যেতে হলো ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে।

না, মাধুরী রাজী হয়নি মহুয়াকে নিয়ে হালদার ম্যানসনে যেতে। এমন কী মহুয়ার জন্যে তার দাদুর দেওয়া গহনার বাক্সটা নিতেও ও রাজী হয়নি। রাজী হয়নি অবনীস হালদারের কাছ থেকে কোন রকম আর্থিক সুযোগ-সুবিধা নিতেও।

কারণ, তাহলে অজিতের স্মৃতির প্রতি অসম্মান করা হতো। এতে তার আত্মা হতো অপমানিত। প্রিয়তমের কাছে যে মাধুরী অঙ্গীকারবদ্ধ। চিরদিনের জন্যে।

আবার সুরু হলো সংগ্রাম।

মহুয়াকে বুকে আঁকড়ে ধরে মাধুরী এবার রুখে দাঁড়ালো ওর নির্মম ভাগ্যদেবতার বিরুদ্ধে। লড়াইয়ে নামলো নিষ্প্রাণ নিয়তির সঙ্গে।

গানের গলা মাধুরীর বরাবরই ভালো ছিলো। একটু তৎপর হতেই ছোটখাট জলসায় চান্স পেতে কোন অসুবিধা হলো না ওর।

মাধুরীর নিষ্ঠা অপরিসীম। ধীরে ধীরে ওর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ডাক আসে বড় বড় জলসা থেকে। প্রোগ্রাম পায় আকাশবাণীতে।

অতঃপর সুরু হয় ওঠার ইতিহাস।

তরতর করে ওপরে ওঠার চমকপ্রদ ইতিহাস। জয়ের ইতিহাস। একটার পর একটা জয়ের ইতিহাস।

আর সেই জয়ের সূত্রেই মাধুরী আজ ফিল্মী-দুনিয়ার সবথেকে নামী এবং দামী প্লে-ব্যাক শিল্পী। অজস্র রসিক-হৃদয়ে সে আজ সম্রাজ্ঞীর মর্যাদায় সমাসীন।

সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা!

কথাটা মনে আসতেই মাধুরী নিজের মনে হেসে ওঠে। একটা সূঁচালো কাঁটার খোঁচায় ওর তাসের ঘর ভেঙে পড়ে।

মাধুরীর ভাগ্যদেবতা অজিতকে কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হলো না। তার হিমেল হাত একদিন প্রসারিত হলো ওর প্রাণাধিকা কন্যার দিকে।

মহুয়ার রোগটা ক্রমশঃ খারাপের দিকে টার্ণ নেয়। চিন্তিত ডাক্তার রায় ওকে নিয়ে ইমিডিয়েট্‌লী ভেলোরে যেতে পরামর্শ দেন।

মাধুরীর মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে।

মহুয়াকে বুকে জড়িয়ে ও আকুলভাবে ঈশ্বরকে ডাকতে থাকে। সারাটা রাত জেগে থাকে ভাবনার আঁধারে নিজেকে সমর্পণ করে।

কী করবে মাধুরী? মহুয়াকে নিয়ে কি ভেলোরে যাবে? কিন্তু —কিন্তু এ যে অনেক টাকার ব্যাপার! এত টাকা ও কোথায় পাবে? কে দেবে এত টাকা?

অসহায়া নারীর আকুল কান্নায় বধির ঈশ্বরের সুখ-নিদ্রায় ব্যাঘাত না ঘটলেও ফিল্মী-দুনিয়ার ডাকসাইটে স্তম্ভ মোহনলাল গোয়েঙ্কার

পৌর-হৃদয়ে ঝড় উঠেছিলো। কোন কারণ জিজ্ঞাসা না করেই সাহায্যের উদার হাত এগিয়ে দিলেন তিনি মাধুরীকে বিস্ময়-বিমূঢ় করে।

একান্ত দুঃসময়ে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্যকারী গোয়েঙ্কাজীকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলে মনে হলো মাধুরীর। গোয়েঙ্কাজীর পরবর্তী ছবিতে কন্‌ট্র্যাক্ট সই করার আগে তাই ওকে সেদিন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলো মাধুরী। প্রণাম করেছিলো নিজের স্নেহাতুর পিতার স্মৃতি স্মরণ করে।

কিন্তু ভাগ্যের দুয়ারে বারবার নিগৃহীত মাধুরী সেদিন কাকে প্রণাম করেছিলো ?

মহুয়াকে ভেলোরে ভর্তি করে মাধুরী কলকাতা ফিরে আসে।

কেটে যায় তিনটি দুঃসহ দুশ্চিন্তার বেদনার্ত মাস। ফুরিয়ে আসে ওর সঞ্চিত অর্থের তলানি।

মাধুরী আবার গোয়েঙ্কাজীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। পরবর্তী ছবিগুলোর জন্যে যদি কিছু অ্যাড়ভান্স পাওয়া যায়। সামনের মাসেই ভেলোরে টাকা পাঠাতে হবে।

গোয়েঙ্কাজীর অফিসে গিয়ে যখন মাধুরী উপস্থিত হলো, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বেহারার নির্দেশ মতো ও গোয়েঙ্কাজীর প্রাইভেট চেম্বারে অপেক্ষা করতে থাকে।

প্রায় মিনিট পনেরো পর চেম্বারের দরজা খুলে যায়।

ভেতরে প্রবেশ করেন গোয়েঙ্কা মানুফ্যাক্‌চারিং-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মোহনলাল গোয়েঙ্কা।

মাধুরী উঠে ওকে প্রণাম করতে যায়।

কিন্তু প্রণাম করা হয় না।

গোয়েঙ্কাজীর চোখে যেন কিসের এক সর্বনাশা তৃষ্ণার কালোছায়া দেখতে পায় ও।

মাধুরী ভয় পায়। দু পা পিছিয়ে আসে। বাইরে যাবার জন্যে বন্ধ দরজার দিকে করুণভাবে তাকায়।

কিন্তু বাঘের চোখে ছিলো সেদিন তপ্ত তাজা রক্তের নেশা। মাধুরী কেন পারবে নিজেকে রক্ষা করতে!

ভীতা-হরিণীর মতো তবুও ও আপ্রাণ চেষ্টা করে ঐ কামুক পশুটার কদর্য লালসা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে।

কিন্তু পারে না।

প্রচণ্ড সংগ্রাম শেষে মাধুরীর অবচেতন দেহটা নিয়ে মেতে ওঠে দক্ষ শিকারী মোহনলাল গোয়েঙ্কা। সুদ-সমেত তুলে নেয় পাঁচ হাজার টাকার উষ্ণ শরীরী স্বাদ।

ট্যাক্সিটা আবার ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে। আর বহু মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বরে মাধুরী ফিরে আসে বর্তমানের বিবর্ণ শিবিরে।

মাধুরী চেয়ে দেখে একটা মিছিল যাচ্ছে রাইটার্স বিল্ডিংস ঘেরাও করতে। সমস্ত মিছিলটা শ্লোগানে-ফেস্টুনে বাঁচার লড়াই-এ সামিল হবার তেজোদৃপ্ত প্রতিজ্ঞায় সোচ্চার। প্রতিটি মানুষের কণ্ঠেই সুগভীর আত্মপ্রত্যয়ের প্রদীপ্ত সুর।

মনে মনে মাধুরী নিজেকেও ঐ মিছিলে সামিল করে নেয়।

মাধুরী ভাবে ও নিজেও তো অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছে। নিজের জন্যে নয়। মহুয়ার জন্যে। প্রিয়তম অজিতের একমাত্র স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে।

তাইতো নিজের দেহের বিনিময়েও পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে ও ছুটে চলেছে ভেলোর অভিমুখে।

মনটাকে একটু সতেজ করে নেবার জন্যে একটা চারমিনারের দারস্থ হই। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে চোখ রেখে পরবর্তী কার্যক্রম ছকে নেবার চেষ্টা করি।

তারপর ?

দিলীপের কণ্ঠে ব্যাকুলতা ঝরে পড়ে।

তারপরের ঘটনা আরো মর্মান্তিক। মেয়েকে নিয়ে সুইজারল্যাণ্ড রওনা হবার আগের রাতে—

আমি একটু থামি। নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে ভয়াবহ কথাটা শেষ করি :

হ্যাঁ, সুইজারল্যাণ্ড রওনা হবার আগের রাতেই নির্মম নিয়তি তার শেষ আঘাত হান্‌লো অভাগিনী মাধুরীর হৃদপিণ্ড লক্ষ্য করে।

আমি থামি। কোটটা গায়ে চাপাই। তারপর গুড্ডিসোনাকে একটু আদর করে ফেরার জন্যে পা বাড়াই।

মাধুরীর কি হলো শেষ পর্যন্ত ?

সজল চোখে রিনিদেবী জিজ্ঞাসা করেন।

কোন কথা বলি না। বলতে পারি না। কেবল ইঙ্গিতে সতেরো নম্বর সেলটা দেখিয়ে দেই।

॥ ১১ ॥

অন্ধকার আকাশের বুকে ঘন তরল মেঘের লড়াই সুরু হয়ে গিয়েছে। হয়তো কয়েক মিনিটের মধ্যেই শ্রাবণ-মেঘেরা বিজয়োল্লাসে ফেটে পড়বে মুমূর্ষু মহানগরীর ক্ষত-বিক্ষত বুকের আঙিনায়। ফেটে পড়বে কর্পোরেশন-সিয়েমডিয়ের অসফল দাম্পত্য-জীবনের প্রতি সুতীক্ষ্ণ আণবিক বিদ্রূপে।

শ্রান্ত ক্লান্ত অভিজিৎ লাহিড়ী তাই আপ্রাণ চেষ্টা করে। বলিষ্ঠ হাতে স্টিয়ারিং ধরে। আপ্রাণ প্রচেষ্টায় পৌঁছে যেতে চায় লাহিড়ী প্যালেসে দ্রুততর গতিতে। সমস্ত অতীতকে পেছনে ফেলে।

গ্যারেজে গাড়ী ঢুকিয়ে প্রায় নেশাগ্রস্তের মতো সে নিজের শোবার ঘরে ঢোকে। তারপর ড্রয়ার থেকে বের করে নেয় চক্‌চকে রিভলভারটা। কার্তুজের বাক্স থেকে বের করে নেয় একটা তাজা কার্তুজ। ভরে নেয় সেটা চেম্বারে।

রিভলভারটা হাতে ধরে কি যেন ভাবে সে। ভাবনার মহাসিন্ধু তরঙ্গায়িত হয় একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের বিধুর ইথারে। মিশে যায় নৈঃশব্দিক বেদনায়। নীরব আত্ম-সমীক্ষায়।

দেওয়ালে টাঙানো সুদৃশ্য ঘড়িটায় জলতরঙ্গের সুর বেজে ওঠে।

অভিজিৎ চমকে ওঠে।

ঘড়ির দিকে তাকায় সে। দেখে রাত এগারোটা। মিষ্টি মেয়েটি তাই তার সুখ-নিদ্রা কামনা করছে।

সুখ-নিদ্রা? হ্যাঁ সুখ-নিদ্রাই বটে।

অভিজিতের বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে আরেকটা দীর্ঘশ্বাস।

হঠাৎ কি মনে করে রিভলভারটা টেবিলের ওপর রেখে লেটার প্যাডটা টেনে নেয় অভিজিৎ।

তারপর পকেট থেকে পেনটা নিয়ে একটা চিঠি লিখতে বসে।

চিঠি লেখা শেষ হয়।

অভিজিৎ এবার ভাবতে থাকে তার ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনের মসীলিপ্ত ঘটনা-প্রবাহের কথা। যে ঘটনা-প্রবাহ তাকে আজ টেনে নিয়ে এসেছে নগ্নতম পরিণতির দিকে।

ব্যস্ত হাতের ধাক্কায় দরজাটা নড়ে ওঠে। অভিজিতের চিন্তা ব্যহত হয়। সে অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করে।

বাইরে থেকে ভেসে আসে ওর কাতর কণ্ঠ:

বাবা, দরজা খোল। দরজা খোল, বাবা।

না। অভিজিৎ দরজা খুলবে না। খুলতে পারে না।

সিঁড়িতে একসঙ্গে অনেক পায়ের শব্দ শোনা যায়।

অভিজিৎ টেবিলের ওপর থেকে রিভলভারটা তুলে নেয়।

লক্ষ্মী বাবা, দরজা খোল।

অভিজিৎ দৃঢ়মুষ্ঠিতে রিভলভারটা ধরে।

বাবু, দরজা খুলুন।

অভিজিৎ রিভলভারটার নিশানা ঠিক করে নেয়।

বাবা—লক্ষ্মী বাবা আমার, দরজা খোল। দরজা খোল।

কোন সাড়া নেই কেন? দরজা ভেঙে ফেলো তোমরা।

না না। আর দেরী করা চলে না। এখনই ওরা দরজা ভেঙে ফেলে তার এই কদর্য রূপটা দেখে ফেলবে। তাকে টেনে দাঁড় করাবে সেই নগ্ন-সত্যের মুখোমুখি। সে সুযোগ ওদের কিছুতেই দেবে না অভিজিৎ।

দরজার ওপর ভারী বস্তুর আঘাত পড়তে থাকে।

অভিজিতের মুখটা ক্রমশঃ কঠিনতর হয়। ট্রিগারের ওপর রাখা হাতটা একটু নড়ে ওঠে।

বাইরে মেঘের গুরুগম্ভীর আওয়াজের সঙ্গে একটা যান্ত্রিক আর্তনাদের সঙ্গম ঘটে যায় সব বিতর্কের সমাপ্তি ঘটিয়ে।

কিন্তু অভিজিৎ হঠাৎ আত্মহত্যা করতে গেলো কেন?

কোন উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে শ্রীমতী মণিদীপা সাহা দিকে এগিয়ে দেই।

গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে শ্রীমতী সাহা চিঠিখানা পড়তে থাকেন ঃ

প্রিয় শোভনলাল,

তোমার বিংশ শতাব্দীর কান্না'র শেষ পর্বটা আর সম্পূর্ণ হচ্ছিলো না প্লটের অভাবে, তাই না? আমি কিন্তু তোমাকে একটা নতুন প্লটের সন্ধান দিতে পারি। এমন একটা ট্র্যাজিক প্লট তোমায় দেবো যে তুমি নিজেও চমকে উঠবে। প্লটের প্রতিটি মানুষের চোখের জলে তুমি নিজেও হয়তো অভিভূত হয়ে পড়বে। ভুল করে তোমার নির্বিকারত্বের সীমা অতিক্রম করে যাবে। নিজেও হয়ে পড়বে বিংশ শতাব্দীর কান্না'র অন্যতম অংশীদার।

ভূমিকা থাক। ঘটনায় প্রবেশ করি, কেমন?

ঘটনা? হ্যাঁ ঘটনা। সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। একেবারে রূঢ় নগ্ন বাস্তব।

কাহিনীর নায়ক একজন দুর্বৃত্ত। একটা চরিত্রহীন লম্পট।

সারাটা জীবন সে শুধু অপরাধ করেছে। একটার পর একটা ঘৃণ্য অপরাধের বিষাক্ত নায়ক সে। হাজারো অন্যায়ের ধিক্কৃত দুরাচার।

যদিও ন্যায়-অন্যায়ের আপেক্ষিক তত্ত্ব দিয়ে বিচার করলে সেগুলোকে অন্যায় বলতে তুমিও দ্বিধা করবে। কিন্তু আমার প্লটের বিড়ম্বিত নায়কের এমনই দুর্ভাগ্য যে তার প্রতিটি কাজই নীতি-বিরুদ্ধ বলে নিন্দিত হয়েছে। সংসারের সকলের কাছেই সে অবাঞ্ছিত বলে উপেক্ষিত হয়েছে। সমাজে থেকেও তাকে অসামাজিক জীবনের গ্লানি ভোগ করতে হয়েছে। জীবনের প্রথম লগ্ন থেকেই।

বুঝতে পারছি তুমি এই দুর্বৃত্তটিকে চিনে ফেলেছো!

তুমি যে জীবন-রসিক। তাইতো এই বিরাট বিশ্বে একমাত্র তুমিই ছিলে তার আঁধার জীবনের স্নিগ্ধ ধ্রুবতারা।

খুব কাব্য হয়ে গেলো, তাই না?

হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম। তুমি ঠিকই বুঝেছো। আমার এ প্লটের নায়ক আমিই—শ্রীঅভিজিৎ লাহিড়ী। আমারই ব্যর্থ জীবনের আর্ত কান্নার ইতিবৃত্ত তোমায় শোনাতে চাইছি আজ। খুব সংক্ষেপেই বলছি।

তুমি তো জানতে বন্ধু, শিখাকে খোঁজার জন্যে প্রতিটি রাতে আমি অভিসারে বেরুতাম। সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আমি খুঁজে বেড়াতাম শিখা আর তার সন্তানকে। আমার জীবনের প্রথম প্রেমকে আর তার পবিত্র উত্তরাধিকারকে। গত পনেরো বছরের মধ্যে এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রাকৃতিক দুর্যোগ—কোন কিছুই আমার এই নৈশ অভিযানের গতিরোধ করতে পারেনি। এমন কী, শারীরিক কোন দুর্বিপাকও আমার এই ব্যাকুল অন্বেষণকে ব্যাহত করতে পারেনি। ক্ষ্যাপা যেমন করে পরশ পাথর খুঁজে বেড়ায়, আমিও তেমনই খুঁজে চলেছিলোম আমার পরশমণি অন্তরের সুগভীর আর্তি নিয়ে।

সেদিন ছিলো শুক্লা চতুর্দশী।

আকাশ ছিলো মেঘমেদুর। তাই পূর্ণচন্দ্রের কোন অস্তিত্ব ছিলো না আকাশের অন্ধকার আঙিনায়। তারাগুলোও অদৃশ্য হয়েছিলো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে অসম-লড়াইয়ের সাধে জলাঞ্জলি দিয়ে। তার ওপর ছিলো বিদ্যুৎকর্মীদের নিয়ম মাফিক কাজের আন্দোলন, আর অস্থির কর্পোরেশনের সংগ্রামী মানসিকতার উৎকট প্রকাশ।

রাস্তায় বেরিয়ে মনে হলো নগর কলকাতা যেন রাতারাতি একটা নারকীয় মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছে। ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল মানুষগুলোকে কপালকুণ্ডলার পালকপিতার আধুনিক সংস্করণ বলে ভ্রম হলো।

একটু পরেই বৃষ্টি এলো।

শ্রাবণের সতেজ বৃষ্টি। যেমন তীব্র তার গতিবেগ, তেমনি তীব্র তার শঙ্খনিনাদ।

আশ-পাশের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

তবুও কঠিন হাতে স্টীয়ারিংটা ধরে অ্যাক্সিলেটারে চাপ দেই। এগিয়ে চলি বিধান সরণী বরাবর শ্যামবাজারের দিকে।

বেথুন কলেজের কাছে এসে হঠাৎ ব্রেক কষি। দ্রুত নেমে গুণ্ডাগুলোর মুখোমুখি হই।

নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেও মেয়েটিকে আমি ওদের হাত থেকে বাঁচাই।

পরিচয় পেতে দেরী হয় না।

মেয়েটির কাছ থেকেই জানতে পারি ওর নাম মণিকা লাহিড়ী। বাবা-মা কেউ নেই। একটা হোমে থেকে পড়াশুনা করেছে। বর্তমানে একটা ছোট ফার্মে ডেস্‌প্যাচ ক্লার্কের চাকরী করে। থাকে কাছেই। রামদুলাল সরকার স্ট্রীটের একটা দোতলা বাড়ির চিলে-কোঠায়। প্রায় একাকী। একটা ঝিয়ের ওপর ভরসা করে।

মেয়েটিকে ওর ঘরে পৌঁছে দেই।

এবং ওর সকৃতজ্ঞ হৃদয়ের আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিতে হয় আমাকে। এক পেয়ালা চায়ের সঙ্গে কিছু নোনতার সাদর আমন্ত্রণ কিছুতেই অস্বীকার করতে পারিনা আমি।

কিন্তু কেন জানিনা মণিকার প্রতি একটা অদ্ভুৎ আকর্ষণ আমি অনুভব করতে থাকি এরপর। কোন কাজে মনযোগ দিতে পারি না। অস্বাভাবিক 'অথচ অপ্রতিরোধ্য একটা প্রণয়-পিপাসা আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে থাকে প্রতিক্ষণ। মনে হয় মণিকার সান্নিধ্যেই আমার শান্তি। আমার অন্ধ-খোঁজার পরিসমাপ্তি।

সত্যি বলতে কি, মণিকার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে আমি যেন আবার নতুন করে বাঁচার তাগিদ অনুভব করলাম। পৃথিবীর যে সৌন্দর্য এতদিন আমার চোখে ফিকে হয়ে পড়েছিলো, মণিকার সাহচর্যের সোনালী-সম্ভাবনায় সে সব আবার রূপে-রসে-রঙে নতুন বেশে আমার মুগ্ধ চোখের সামনে উপস্থিত হলো।

আমি মণিকাকে ভালোবেসে ফেললাম।

আমি—হৃতসর্বস্ব অভিজিৎ লাহিড়ী স্বপ্নেয় উত্তরণের অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষায় আবার ভুল করলাম। পা বাড়ালাম আমার বিমুখ ভাগ্যদেবতার নির্মম ফাঁদে।

মনে দ্বিধা ছিলো। কারণ নিজের অতীত-জীবন। কারণ মণিকার সঙ্গে আমার বয়সের দুস্তর ব্যবধান। তবুও সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটিয়ে একদিন এগিয়ে গেলাম ওর নারী-হৃদয়ের নিকটতর সান্নিধ্যে।

একটা তীব্র কৃতজ্ঞতাবোধের জোয়ারে মণিকা আগে থাকতেই অভিভূত ছিলো। সুতরাং আমার প্রস্তাবে নতমুখী হলো। সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার প্রেমে নিজেকে সমর্পণ করতে সে সাগ্রহ সম্মতি জানালো।

তবুও নিশ্চিত হবার জন্যে আমি বয়সের ব্যবধানের কথা তুললাম। আমি বললাম ঃ

মণিকা, তুমি ভালো করে ভেবে দেখো। প্রয়োজন হলে সময় নাও। আবেগের বশে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ো না।

এ কথা কেন বলছো ? তুমি কি এতদিনেও আমার মনের কথা বুঝতে পারো নি ?

কিন্তু তোমার আর আমার বয়সের—

ছিঃ! ওকথা বলো না। তুমি তো হিন্দু। শিব-পার্বতীর কথাও কি জানো না তুমি ?

মণিকা !

হ্যাঁ, মণিকার কথায় সেদিন আমি আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। আমার মুখের ভাষা রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো পরম প্রাপ্তির স্নিগ্ধ আশ্লেষে।

তারপর—তারপর গভীরতম মমতায় নিবিড়তম ভালোবাসায় আমি মণিকাকে কাছে টেনে নিলাম। বুকের কাছে। আমার তৃষিত হৃদয়ের কাছে।

মণিকা বাধা দিলো না। নিঃশেষে সঁপে দিলো নিজেকে আমার বিরাজিত আলিঙ্গনে। পরম নির্ভরতায়।

এক সময় আমার বাহু-বন্ধন মুক্ত করে দিলাম।

তারপর আমরা মুখোমুখি বসলাম। ঝি দু কাপ চা ও কিছু চানাচুর দিয়ে গেলো।

চা খেতে খেতে আমরা গল্প করতে লাগলাম। নানা গল্প। যার অধিকাংশই ছিলো আমাদের ভাবী সংসারের পরিকল্পনা ঘিরে রোমান্টিক অভিলাষ আর উচ্ছাসের মুখর স্বপ্ন-কথা।

এক সময় মণিকা ভারী গলায় বললো ঃ

জানো, আজ যদি আমার মা বেঁচে থাকতো, খুব খুশী হতো।

কি হয়েছিলো তোমার মার ?

ভুল করে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলেছিলেন বেশী মাত্রায়।

ভুল করে ?

আমার কণ্ঠে অতীব বিস্ময়ের সুর।

ব্যাপারটায় আমারও খটকা লেগেছিলো। অবশ্য অনেক পরে। কারণ, মা যখন মারা যান তখন আমার বয়স মাত্র আট বছর। সব কিছু বোঝার ক্ষমতা তখনও হয় নি আমার।

তারপর ?

মায়ের মৃত্যুর পর কদিন খুব কাঁদলাম। ছোট্ট মেয়ে। কী করবো কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। শুধু ফাদার গ্রাহামের বুকে মুখ রেখে মার আত্মার শান্তি কামনা করেছিলাম পরমপিতা যীশুর কাছে।

ফাদার গ্রাহাম ?

হ্যাঁ, উনিই ছিলেন আমাদের আশ্রয়দাতা।

তোমার বাবা ?

আমার জন্মের আগেই তিনি আমার মাকে ত্যাগ করেছিলেন।

কেন ?

কেন আবার ? অন্য একজনকে—। যাক সে সব কথা। তুমি অন্য কথা বলো। বাবার কথা আলোচনা করতে আমার একদম ভালো লাগে না। বরং আমার মার কথা বলো। আমার মার ছবি দেখবে ? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। দেখবে কী সুন্দর মা মা গন্ধ সারা ছবিটাতে। উই পোকার জন্যে ছবিটা টাঙাতে পারি না। তাছাড়া দেওয়ালটাও তেমন শক্ত নয়। খুব পুরনো বাড়ি কিনা।

কথাগুলো বলতে বলতে মণিকা এগিয়ে যায় দেওয়ালের দিকে।

দেওয়ালের গায়ে পর পর রাখা দুটো ট্রাঙ্ক।

মণিকা ওপরের ট্রাঙ্কটা নামিয়ে পাশে রাখে। তারপর নিচের ট্রাঙ্কটা খুলে কাগজে জড়ানো একটা ছবি নিয়ে ফিরে আসে।

কাগজটা খুলে মণিকা ওর মায়ের ছবিখানা আমার চোখের সামনে তুলে ধরে। আমি অসীম আগ্রহ নিয়ে ছবিখানার দিকে তাকাই।

কিন্তু এ কী!

সমস্ত পৃথিবী অকস্মাৎ আমার চোখের সামনে কেঁপে উঠলো কেন? ছবির ভেতর থেকে ও এমন বিশ্রী করে হেসে উঠলো কেন? এতদিন বাদে এমন নির্মম প্রতিশোধ নিতেই কী ও আলেয়ার মতো আমাকে এখানে টেনে এনেছে?

আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো।

আমি তীব্রতম যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম।

ভয় পেয়ে মণিকা ছবিখানা রেখে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমার গায়ে পিঠে আশ্বাসের পরশ বুলিয়ে দিতে চাইলো।

আমি কোন মতে ওকে সরিয়ে দিয়ে টল্‌তে টল্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিতে এবার আর ভুল করলাম না।

ক্লেদাক্ত যাত্রার শেষে আমি সবশেষ দ্রাঘিমার শেষ সীমান্তে এসে পৌছেছি। কিন্তু দিনান্তের সূর্যের মতো আমি তো কোন সোনাভরা আশা ছড়িয়ে যেতে পারলাম না আমার আত্মজার জীবনকে সহজ-সরল-সুন্দর করে তুলতে। তাকে তার যথাযোগ্য আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে।

শিখাকে খুঁজে না পেলেও ওর সন্তানকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম আমি। কিন্তু—কিন্তু বড্ড বেশি দেরী হয়ে গেলো যে!

বিদায়, বন্ধু। বিদায়।

ইতি
অভিজিৎ লাহিড়ী

চিঠিখানা শেষ করার পর শ্রীমতী মণিদীপা সাহা উদাস ভাবে জানালার ভেতর দিয়ে বৃষ্টিভেজা প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকেন। সম্ভবতঃ কিছু লবণাক্ত বেদনাকে সংগোপনে ছড়িয়ে দেবার জন্যে। কিম্বা হয় তো বিধুর হৃদয়ের গভীর আর্তি নিয়ে বিধাতার কাছে প্রাক্তন স্বামীর আত্মার কল্যাণ কামনার জন্যে।

আমি একটা চারমিনার ধরাই। ধোয়ার কুহেলী বানিয়ে পাড় করে দেই কিছু নিশ্চল মুহূর্ত। তারপর ফিরে তাকাই পনেরো বছর আগেকার এক ঝড়ো রাতের দিকে।

দীপা!

বলো।

এটাই তাহলে তোমার শেষ সিদ্ধান্ত।

হ্যাঁ।

কোন ভাবেই কি এই সিদ্ধান্তটা তুমি পাল্টাতে পারো না, দীপা।

না। সেটা আর সম্ভব না।

দীপা!

না, না। তোমার সঙ্গে এক ঘরে বাস করা আমার পক্ষে আজ অসম্ভব। তাছাড়া এমন ভাবে বাস করাও যায় না।

কিন্তু আমি তোমার স্বামী। তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

সে কথা আজ আর আমি স্বীকার করি না।

দীপা!

তুমি মিথ্যে সময় নষ্ট করছো। আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল।

তাহলে তুমি—

হ্যাঁ। দীপঙ্করের কাছেই আমাকে যেতে হবে।

শান্তি পাবে?

তাহলেই কি তুমি সুখী হবে?

অন্ততঃ চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

বেশ, তবে তাই হোক। তুমি সুখী হও। তোমার জীবনে আসুক অনন্ত উদার শান্তি। আর—আর দীপঙ্করবাবুকে আমার অভিনন্দন জানিয়ো, দীপা। চলি।

চারমিনারের আগুণ নিভে গিয়েছিলো। নতুন করে ওটা ধরিয়ে নেই। তারপর ফিরে যাই আবার সেই অতীতের বুকে।

অমন করে কী দেখছো? আমি ভূত নই, মানুষ। মণিদীপা নই, রক্তকরবী। হাতে তুলে নিতে পারবে?

মানে?

মানে, সেদিন বাবার অধীন ছিলাম। বুদ্ধিও খুব একটা ছিলো না। তুমি এত লেখাপড়া করেছো, এটা জানো না বিধাতা মেয়েমানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন কম। লোভ দিয়েছেন বেশি। জানো না মেয়ে মানুষের বাসনা পূরণ করবার মতো অসংখ্য সামগ্রী পৃথিবীতে নেই। টাকা, ভালোবাসা, রূপ, বিলাস, অলঙ্কার, খ্যাতি—কোনটা সে না চেয়ে পারে? কোন্ নারী সতী? বার বার সতী বলে তাদেরই ডাকতে হয়, যারা সতী নয়। ঋষিরা নারী-চরিত্র জানতেন। তাই একদিকে তারা নারীকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবার বিধান দিতেন, অন্যদিকে দিনরাত সতীত্বের মন্ত্র জপাতেন। তাঁরা নিজেদের চরিত্র জানতেন বলেই নারীকেও জানতেন।

পুরুষ ও নারী দুইই মানুষ। কোন্ পুরুষ একনিষ্ঠ, এক নারীকে নিয়ে সুখী? সত্যিই তার মধ্যে যদি পৌরুষ থাকে? তুমিও যদি আমাকে সত্যিই পেতে, এ সত্য বুঝতে পারতে।

একদিন আমাকে নিয়ে তোমার খেলা ফুরতো। রক্তকরবী একদিন বাসি হতো নিশ্চয়ই। এর ফুল, পাতা ছিঁড়ে ছিড়ে দেখবার স্থযোগ পাওনি বলেই, আজো তাকে চাও। বোধ হয় তার জন্যে প্রাণ দিতেও তুমি প্রস্তুত।

তোমাকে পাওয়ার লোভ আমার সেদিনও ছিলো, আজও আছে।

কারণ, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ করে পাওয়ার আগেই হারিয়েছি। যার সঙ্গে বিয়ে হলো, সে এখন আমাকে চায় না। তাকে দোষ দিতে পারি না। আমি তোমাকে চাই। নিতে পারবে আমাকে?

তুমি যে বিবাহিতা!

বিবাহটা কি বস্তু,—সে তুমিও জানো। আমিও জানি।

তবু—

আইন বাধা হবে না!

তোমাকে নিলাম। তারপর?

ছুজনে নতুন করে ঘর বাঁধবো। জীবন নিতান্ত ছোট। যৌবন আরো ক্ষণস্থায়ী। বিধি-বিধানের বর্বরতা নিয়ে বিলাস করবার মতো যথেষ্ট সময় বিধাতা আমাদের দেননি। একথা মনে রাখলেই আপাততঃ কাজ চলে যাবে। সতী আমি নই। তোমাকেও তাই অচল পাহাড় হতে বলবো না। রাজী?

অভিভূত দীপঙ্কর এ কথার কোন উত্তর দিতে পারে না। আনন্দের আতিশয্যে তার বাক্‌শক্তি লোপ পেয়ে যায়। সে কেবল তৃষিত দৃষ্টি দিয়ে মণিদীপাকে দেখতে থাকে।

সমগ্র অন্তর দিয়ে সে আজ অনুভব করে পদ্মপাতায় যেমন জল নিশ্চল হতে পারে না, প্রেমাস্পদার প্রতি অভিমানও তেমনি স্থায়ী হতে পারে না।

মণিদীপা কিছুটা এগিয়ে আসে। দীপঙ্কর আর দেরী করে না।

অসমাপ্ত চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে সে। নিজেও ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। মুখোমুখি হয় মণিদীপার। তারপর সহসা তাকে টেনে আনে বুকের কাছে।

মনিদীপা বাধা দেয় না। এক অনির্বচনীয় আনন্দে ওদের দুজনেরই মন ভরে ওঠে আজ।

আমার রোমন্থন ব্যাহত হয়। চারমিনারের শেষাংশ আঘাত করে চেতনার প্রান্তে। আমি ফিরে আসি বর্তমানের বিয়োগান্ত পরিশিষ্টে। চেষ্টা করি শ্রীমতী সাহার দৃষ্টি আমার দিকে ফিরিয়ে আনতে।

মণিদীপা দেবী!

মনিদীপা দেবী চম্‌কে ওঠেন। শরীর থর থর করে কেঁপে ওঠে। আস্তে আস্তে উনি আমার দিকে ফিরে তাকান। দুচোখে ওর স্থবির চাহনি। উদ্গত অশ্রুর অশান্ত তরঙ্গ।

আমি কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করি। ভাবনাটাকে সংহত করি। তারপর সরাসরি ওকে প্রশ্ন করিঃ

আমি এখন শ্মশানে যাবো। আপনি কি—

তা হয় না, শোভনলালবাবু।

কেন হয় না?

বল্‌তে বল্‌তে ঘরে ঢোকে বন্ধু দীপঙ্কর। শ্রীমতী সাহার বর্তমান স্বামী। প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী দীপঙ্কর সাহা।

দীপঙ্কর!

মণিদীপা আর্তস্বরে চিৎকার করে ওঠে।

শান্ত স্বরে দীপঙ্কর বলতে থাকেঃ

শোন মণিদীপা, শোভনলাল ঠিক কথাই বলেছে। তুমি মিথ্যে দ্বিধা করছো। মৃতের প্রতি সম্মান দেখানো প্রত্যেক মানুষেরই পবিত্র কর্তব্য। তাছাড়া, এই অভিজিৎ লাহিড়ী একদিন তোমার স্বামী

ছিলেন। একদিন তাঁকেও তুমি ভালোবেসেছিলে। তাঁর সুখ-দুঃখের—

তুমি থামো। তুমি থামো, দীপঙ্কর। আমি আর পারছি না। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

কথাগুলো শেষ করে গভীরতম বেদনায় ডুকরে কেঁদে ওঠেন এক কালের ডাকসাইটে সুন্দরী মণিদীপা সেন। সোসাইটির মক্ষিরাণী অনুপমা মণিদীপা সেন।

দীপঙ্কর এগিয়ে যায়।

তারপর স্ত্রীর শিথিল দেহটা ধরে তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করে।

আমি এখন চলি দীপঙ্কর। চলি, মণিদীপা দেবী।

শোভনলাল!

আমার আর দেরী করলে চলবে না, ভাই।

দীপঙ্করকে আর কোন সুযোগ না দিয়েই আমি ওদের ফ্লাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি।

রাস্তায় নেমে একটা চলন্ত ট্যাক্সি হাত নেড়ে থামাই। ভেজা শরীরটাকে তাড়াতাড়ি চালান করে দেই ট্যাক্সির ভেতর।

নির্দেশ পেয়ে ট্যাক্সি ছুটে চলে উত্তরে। মহাশ্মশান নিমতলার দিকে।

লেখকের বিভিন্ন গ্রন্থ সম্পর্কে কয়েকটি মতামত

নাট্যকার মন্মথ রায়—"……ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত এ নাটকের প্রধান চরিত্র সুলতান মহম্মদ-বিন-তোগলক। নিরপেক্ষ-বিচারের অভাবে ভাগ্যবিড়ম্বিত সুলতান আজও এক নিন্দিত চরিত্র।……দুঃসাহসীর মতো প্রয়াসী হয়েছেন এই নিয়তি-নিপীড়িত হতভাগ্য সুলতানের অন্তর্দ্বন্দ্বের সঠিক পরিচয় পাঠকের সামনে তুলে ধরতে।……দ্বিতীয় অঙ্কে এক সময় সুলতানকে একলা মঞ্চে রেখে তার স্বগতোক্তি (soliloquy) যে ভাবে মঞ্চমায়া (stage illusion) তথা ইঙ্গিতের (suggestion) মাধ্যমে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা রীতিমত প্রশংসনীয়।……'পরিণাম' যে মানবিক গুণে সমৃদ্ধ একখানি চিত্তাকর্ষক নাটক তা বলতে আমার দ্বিধা নেই।"

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (District Social Education Officer, Cooch Behar)—"……'Parinam' has created a new style and art……'Parinam' has been staged here in the district of Cooch Behar by various cultural organisations…… and have been appreciated by the public very much……."

দৈনিক বসুমতী—"………'পরিণাম' মুসলমান চরিত্রবহুল একটি চিত্তচাঞ্চল্যকর ঐতিহাসিক নাটক………বিয়োগান্ত এই নাটকটির সংলাপ, রচনা ও ঘটনা সংস্থানে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার। বইখানি স্টেজে ভালভাবে অভিনীত হলে দর্শকরা প্রচুর আনন্দ পাবেন……"

গ্রন্থাগার—"……মহম্মদ-বিন-তোগলক এক ভাগ্যবিড়ম্বিত চরিত্র। ……মহম্মদের অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের উপস্থাপনা প্রশংসনীয়। ফ্লাশব্যাকের মাধ্যমে উপস্থাপিত ঘটনা নাটকীয় গতিকে তীব্রতর করেছে। অন্যত্রও এই সংঘাত বিদ্যমান। নাটকের শেষ দৃশ্য পর্যন্ত সংঘাত এবং suspense রক্ষিত হয়েছে…… ।"

উপন্যাস | বিংশ শতাব্দীর কান্না (১ম পর্ব)

স্বামী জ্ঞানানন্দ—"......'বিংশ শতাব্দীর কান্না' পড়ে এই অশীতিপর বুড়োর বিপ্লবী-চোখেও জল এলো।......গল্পের যে অংশে নোয়াখালির একটা ঘটনার উল্লেখ আছে, তা পড়তে পড়তে একটা বাস্তব চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আমি তখন নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে অনুরূপ কয়েকটি মর্মন্তুদ কাহিনী জানতে পারি...... ।"

সাহিত্যিক সম্রাট সেন—"......চামেলি বাঈ থেকে শুরু করে মণিদীপা সেন, ডলি, রূপালী, চম্পা প্রভৃতি যে নারীচরিত্রগুলি আসা-যাওয়া করেছে তাদের উপস্থিতি ক্ষণিক হলেও, সীমিত পরিসরে তাদের ক্ষোভ, দুঃখ, অসহায়তা এবং সর্বোপরি প্রণয়-সিক্ত হৃদয়-মাধুরী সহজেই চিত্ত আকৃষ্ট করে। ......শিল্পীসুলভ নিরাসক্তি থাকার জন্য কোন চরিত্রকেই গাঢ় রঙে অবলিপ্ত না-করে রেখাংকণ-কর্মটুকু করেই পাঠকের কল্পনা ও রসবোধের উপর পূর্ণতার ভার ছেড়ে দিয়েছেন...... । সমাজে নারীর অসহায়তা (চামেলি বাঈ), হৃদয়ের দুর্ভার পীড়নে ভুল বোঝাবুঝি (মণিদীপা সেন), আর্থিক অসাম্যের জন্য প্রণয়-পুরুষ পরিবর্তন (ডলি), অত্যাচারী স্বামীর প্রবল কামনাবহ্নিতে বারংবার আত্মদানে ক্লান্ত স্ত্রীর ক্ষণিক বাসনা-স্ফুলিংগ (সাবিত্রী লোহানী), ব্যর্থ প্রেমিকের মৃত্যুশয্যায় স্বপ্নের মধ্যে পূর্ব প্রণয়িনীর সাক্ষাৎ (করবী চ্যাটার্জি), নাগিনী-কন্যার প্রণয় ও ব্যর্থতা (চম্পা) প্রভৃতি বিষয় ও চরিত্রগুলি চকমকি পাথরের মতো ক্ষণ-দীপ্তিতে উজ্জ্বল। এদের প্রত্যেকের চোখের জলের ফোঁটাগুলি সংগ্রহ করেই 'বিংশ শতাব্দীর কান্না'...... ।"

উপন্যাস | বিংশ শতাব্দীর কান্না (২য় পর্ব)

অধ্যাপক বিনয় সরকার (সাধারণ সম্পাদক, বাংলা সাহিত্য একাডেমী)-"......বিশ শতকী বিশ্বের বুকে জমে-থাকা কান্নার পাহাড়টা তার দরদী হৃদয়ের উত্তাপে ক্রমশঃ তরল হয়েছে।...শ্রীসুধাংশু দে থেকে শুরু করে মিতালী রায়, গৌতম মাহাতো, সন্ধ্যা মিত্র, সুশান্ত চৌধুরী, দেবাশিস রায়, রিচার্ড স্মিথ বা

লায়লা খাতুন—এদের প্রত্যেককেই পাঠকের পরিচিত বলে মনে হবে। স্বল্পকালীন উপস্থিতি সত্ত্বেও এরা এদের জীবনের ব্যথা-বেদনা, ক্ষোভ-দুঃখ, ভয়-অসহায়তা এবং সর্বোপরি প্রণয়-পিপাসু মনের গভীর অন্তর্দাহের সকরুণ চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে।······দুই বিখ্যাত গীতিকার বেতার-শিল্পী শ্রীদিলীপ সরকার এবং বেতার-শিল্পী শ্রীজটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের লেখা দুখানি গান 'বিংশ শতাব্দীর কান্না'কে নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক করেছে···।"

কাব্যগ্রন্থ | মণিদীপা সেন

প্রেমেন্দ্র মিত্র—"······অনেকগুলি কবিতা পড়ে দেখলাম। কবিতা লেখার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু অধিকার আর যোগ্যতা এক জিনিষ নয়। শ্রীসাহাকে তাঁর লেখা কবিতাগুলি বই আকারে ছাপতে যাঁরা উৎসাহ দিয়েছেন তাঁরা যোগ্যতার বিচার করেন নি একথা পাঠক সাধারণ আশা করি বলবেন না।

অধ্যাপক বিনয় সরকার (সাধারণ সম্পাদক, বাংলা সাহিত্য একাডেমি) : "······প্রতিটি কবিতার মধ্য দিয়েই কবির জীবন-দর্শন, মননশীলতা এবং কাব্য-মেজাজের সুস্পষ্ট প্রকাশ সুচারু বিন্যাসে সার্থক হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে নিপুণ কারুকার্য, অকুণ্ঠ নিষ্ঠা এবং গঠন-পদ্ধতির বৈচিত্র্যে কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে বাংলা কাব্যসাহিত্যভাণ্ডারে এক অমূল্য সম্পদ।······বিশেষ করে, 'মণিদীপা সেন' কবিতাটিতে নায়ক দীপঙ্কর সাহার দেহজ প্রেম থেকে দেহাতীত প্রেমে উত্তরণের যে চিত্রটি কবি দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা দুঃসাহসিক হলেও সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত এবং নিখুঁত।······।"

অমৃত—"······'মণিদীপা সেন' নামে কবিতার বই-এর অনেকগুলি কবিতা পড়ে দেখলাম···বিভিন্ন কবিতায় কবির যৌবন, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবোধ, প্রেম ও আর্তি প্রকাশিত হয়েছে।"

কাব্যগ্রন্থ | প্রিয়তমাসু

কবিশেখর কালিদাস রায়—"······'প্রিয়তমাসু' বইটির কবিতাগুলি মূলতঃ প্রেমের ও দেশপ্রেমের।······শুধু কবি ন'ন, প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি,

বইটাতে তাঁর সে পরিচয় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। কবি কিন্তু গীতিকাব্যের জগতেই শুধু বিচরণ করেন নি, তিনি নিছক স্বপ্নবিলাসী ন'ন, তিনি রীতিমত বাস্তববাদী, বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের সচেতন নাগরিক, তার পরিচয় বহু কবিতায় প্রকাশিত…তাই বলে স্বপ্ন দেখতেও তিনি ভুলে যান নি—যে স্বপ্ন চিরদিনের চিরকালের স্বপ্ন—

অশরীরী রহস্যে-ঘেরা কোন এক রক্ষিতার বন্ধুর বুকে।
আমার-স্বপ্ন অবশেষে রূপায়িত হলো কমনীয় কবিতা হয়ে।
কবি স্বধর্মে নিষ্ঠ থাকুন এই আশীর্বাদ জানাচ্ছি……।"

কাব্যগ্রন্থ | একটু নরম সুখ

কবিশেখর কালিদাস রায়—"……শ্রীমান দিলীপ সুখ্যাত কবি, শুধু কবি নয়, প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি। এ বইটিতে তার সে পরিচয় ছত্রে ছত্রে। কবিতার দিন তো যায় নি, কবিতা এখনও কবিদের আরাধ্যা আছেন, এই বিশ্বাস নিয়ে আমি বিদায় নিতে পারবো……।"

শ্রীসত্যব্রত সেন (Principal, Librarianship Training Centre, Rahara)—"· দিলীপকুমার সাহার কবিতা দুর্বোধ্য জগতে সুবোধ্য, আনন্দদায়ক। কাব্যগ্রন্থে যে জীবনের অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়, তাকে লালন-পালনের ভার গ্রন্থাগারের ওপর বর্তেছে। প্রত্যেক গ্রন্থাগারে অন্যান্য আধুনিক কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে দিলীপবাবুর 'একটু নরম সুখ' স্থান পাবার উপযুক্ত। তাঁর কাব্যচর্চা মিষ্টিপথ ধরে সহজ সাবলীল পথ-পরিক্রমায় ভাস্বর……।"